স্বর্গ ভ্রমণ

লীলাবতী ভাগবত

স্বর্গ ভ্রমণ
ও
অন্যান্য গল্প

লেখিকা : লীলাবতী ভাগবত
চিত্রাঙ্কন : যতীন দাস

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া
নয়া দিল্লি

November 1970 (Agrahayan 1892
দ্বিতীয় মুদ্রণ : 1981 (শক 1903)

A TRIP TO HEAVEN AND OTHER STORIES

(Bengali)

Translated by :

Indrani Sarkar

Published by Director, National Book Trust, India, A-5 Green Park, New Delhi-16 and Printed at Rekha Printers Pvt. Ltd, New Delhi-110020.

স্বর্গ-ভ্রমণ

শঙ্কর রাজার প্রধান মালী। বাগানের কাজে তাকে উদয়-অস্ত খাটতে হোত। রাজার এই বিরাট বাগান নানা রঙের ফুলে, সবুজ ঘাসে আর বড় বড় গাছে ভরা। শঙ্করের কাজ ছিল গাছে জল দেওয়া, ঝরাপাতা ঝাঁট দেওয়া, চারাগাছের তদারক, আগাছা ওপড়ানো আর মাটি খোঁড়া. সার দেওয়া ও ঝোপ-ঝাড় কেটে সমান করা। বাগানের এক কোনে তার কুঁড়েঘর। সেখান থেকে বাগানের দিকে সে সব সময় নজর রাখত।

একদিন রাত্রে শঙ্কর কিছুতেই ঘুমতে পারছিল না। অনেক রাত অবধি সে এ-পাশ ও-পাশ করে কাটাল। তারপর উঠে বসে হঠাৎ সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল। নিজের চোখকে কিছুতেই সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ভাবল নিশ্চয়ই ভুল দেখছে। আবার তাকাল —রূপালী চাঁদের আলোয় ভরা চারিদিক, বিরাট একটা সাদা হাতি চুপিসাড়ে টাটকা সবুজ ঘাস খাচ্ছে।

শঙ্কর একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল! হাতিটা এলো কোথা থেকে? তার ওপর হাতিটা একেবারে সাদা! শঙ্কর আগে কখনও সাদা হাতি দেখেনি। হঠাৎ তার মনে পড়ল, যখন সে খুব ছোট ছিল, মা তাকে প্রায়ই স্বর্গের ঠাকুর-দেবতার গল্প বলতেন। এইসব দেবতাদের রাজা

ছিলেন ইন্দ্র, তিনি ঐরাবত নামে একটি সুন্দর হাতির পিঠে চড়ে বেড়াতেন। হাতিটি দুধের মত সাদা দেখতে।

শঙ্কর তাই চেঁচিয়ে উঠল, "এটা নিশ্চয়ই সেই ঐরাবত। স্বর্গের সুন্দর একঘেয়ে জীবন যাত্রায় ক্লান্ত হয়ে পরিবর্তনের আশায় পৃথিবীতে নেমে এসেছে। যদি আমি এর ল্যাজটা ধরে থাকতে পারি তাহলে ঐরাবত আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে ফিরবে। আমি তাহলে স্বর্গের সমস্ত কিছু দেখতে পাব।"

শঙ্কর বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। পাছে তার বৌ-এর ঘুম ভেঙ্গে যায় তাই সে পা টিপে টিপে নিঃসাড়ে হাতির দিকে ছুটে গেলো।

গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে শঙ্কর হাতিটিকে দেখতে লাগল। ঘাস খাওয়া হলে হাতীটি কচি-পাতায় ভরা চারাগাছ আর আধপাকা আমে ভরা গাছগুলির দিকে এগুল। শঙ্কর এতটুকুও আপত্তি করল না। স্বর্গে যাবার জন্যে সে এত অধীর হয়ে পড়েছিল যে হাতিটিকে সে মোটেই চটাতে চাইল না।

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতির খাওয়াও শেষ হল। শুঁড় তুলে হাতি আওয়াজ করল। শঙ্কর বুঝল, এবার হাতি স্বর্গে ফিরে যাবে। দৌড়ে গিয়ে সে হাতির ল্যাজটা চেপে ধরল। ঐরাবত উড়ো-জাহাজের মতো আকাশে উড়ে চলল। ক্রমশঃ মেঘের অনেক ওপর দিয়ে যেতে লাগল। শঙ্কর নিচের দিকে তাকাল খুব সাবধানে। দূরের আকাশ থেকে রাজার বাগানটিকে মনে হচ্ছিল ছোট্ট একটি বিন্দু। ভয়ে শঙ্করের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বিন্দু বিন্দু ঘামও দেখা দিল তার কপালে। ঠিক সেই সময় তারা স্বর্গে এসে পৌছল। শঙ্কর এবার ঐরাবতের ল্যাজ ছেড়ে দিয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগল।

শঙ্কর অবাক হয়ে দেখতে লাগল। "এটা নিশ্চয়ই নন্দন-কানন— স্বর্গের বাগান! আহা, গাছগুলো কতবড় আর কি সুন্দর! আমি ভেবে
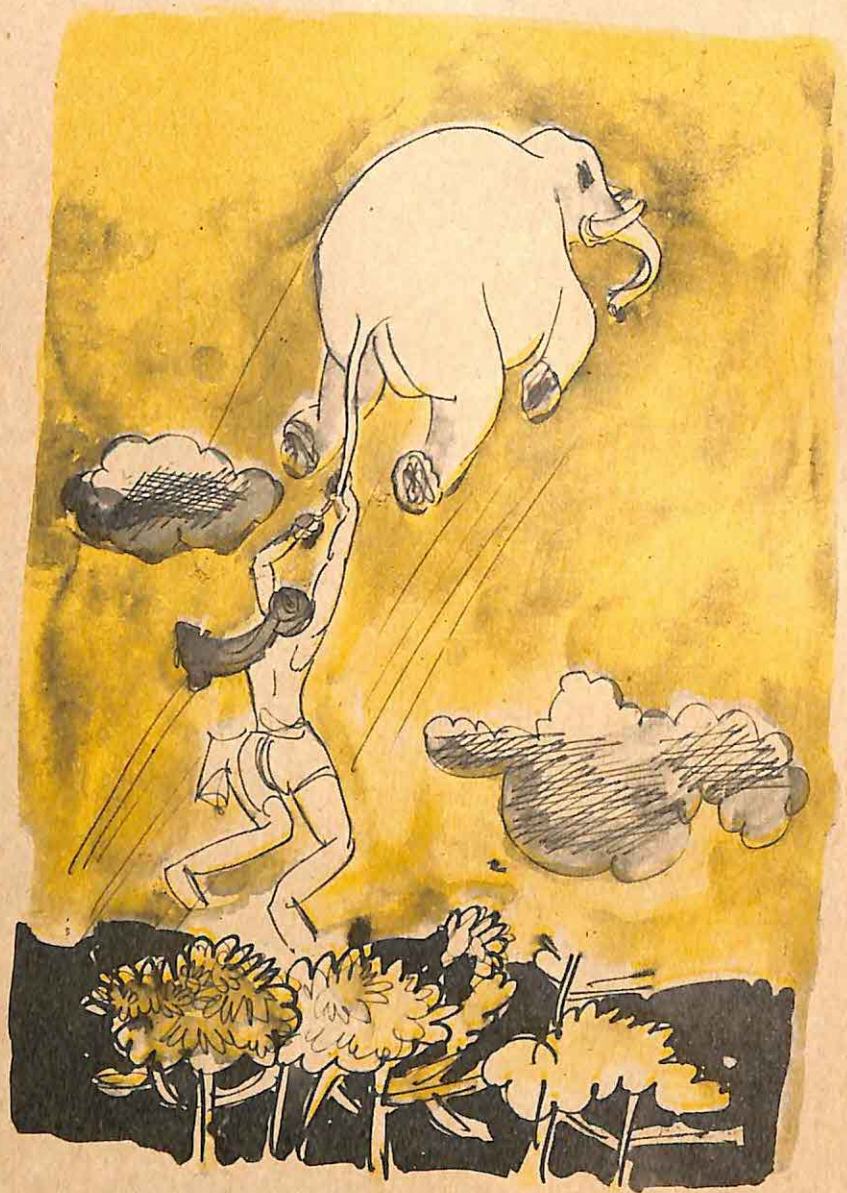
পাই না ইন্দ্র রাজার মালী কি সার দেয় গাছে?'' এই ভাবতে ভাবতে শঙ্কর অবাক বিস্ময়ে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। পৃথিবীর গাছের চেয়ে গাছগুলো দশগুণ বড়, পাতাগুলো দশগুণ সবুজ, ফলগুলো দশগুণ বেশি সুস্বাদু আর ফুলগুলো দশগুণ বেশি রঙচঙে। শঙ্কর সারাটা দিন কাটিয়ে দিল ফুল দেখে, পাতা ছুঁয়ে, আর টুসটুসে রসে ভরা ফল খেয়ে।

দিনের শেষে হঠাৎ তার বৌ-এর কথা মনে পড়ল। ভাবল, বৌ বেচারী নিশ্চয়ই এতক্ষণে তার জন্যে ভেবেচিন্তে অস্থির হয়ে পড়েছে। শঙ্কর ঠিক করল তার বৌ-এর জন্যে স্বর্গ থেকে একটা কোন উপহার নিয়ে যাবে।

নারকেলের মতো বড় একটা সুপুরি আর কলাপাতার মতো বড় একটা পান শঙ্কর সঙ্গে নিল। রাত্রি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতি ডাক দিল। পৃথিবীতে ফেরার সময় হয়েছে জেনে শঙ্কর দৌড়ে গিয়ে হাতিটির ল্যাজ চেপে ধরল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে রাজার বাগানে ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে সে বাড়িমুখো হো'ল। গিয়ে দেখল তার বৌ উদগ্রীব হয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

"বলি, এতক্ষণ থাকা হয়েছিল কোথায়?" রেগে বৌ বলে উঠল।

''রাগ কর না লক্ষ্মী'', শঙ্কর খুব শান্ত ভাবে বলল। ''এই দেখ না তোমার জন্যে কি এনেছি'', বলেই শঙ্কর তাকে সুপুরি আর পান দেখাল।

শঙ্করের বৌ লক্ষ্মী সুপুরি আর পান দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞসা করল, ''তুমি কোথা থেকে এই বিরাট বিরাট জিনিষ পেলে?''

''স্বর্গ থেকে'', বলে শঙ্কর বৌকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। প্রথমে লক্ষ্মী তার কোনো কথাই বিশ্বাস করছিল না। কিন্তু চোখের সামনে অতবড় পান আর সুপুরি দেখে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস না করে সে পারল না।

শঙ্কর তাকে সাবধান করে বলে দিল সে যেন একথা কাউকে না বলে। আরো বলল এই বিরাট সুপুরি তাদের এক সপ্তাহের খোরাক জোগাবে। আবারও সাবধান করে মনে করিয়ে দিল, ভুলেও যেন লক্ষ্মী একথা কাউকে না বলে।

লক্ষ্মী যদিও প্রতিজ্ঞা করেছিল যে সে কাউকে এ কথা বলবে না, কিন্তু না বলেও সে থাকতে পারল না। সে একেই কথা বলতে ভালোবাসত, তার ওপর শঙ্কর যখন আবার স্বর্গ থেকে একটা বিরাট রসালো ফল নিয়ে ফিরল তখন লক্ষ্মী নিজেদের ভাগ্য ফেরার কথা বন্ধুদের বলবার জন্যে আরও ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কোনো রকমে এবারেও সে নিজেকে সামলে নিল। এরপর শঙ্কর আবার স্বর্গে গেল আর ফেরার সময় একটা বিরাট ফুল নিয়ে ফিরল। এই ফুলের সুগন্ধে তার কুঁড়ে ভরে গেল। লক্ষ্মীর এক বন্ধু তাকে জিজ্ঞাসা করল, "কি চমৎকার আতরই না তুমি ব্যবহার কর। কোত্থেকে পেলে?" "আমি কোনও আতর ব্যবহার করি না", লক্ষ্মী উত্তর দিল। "এটা আমার ঘরে যে বিরাট ফুলটা আছে তারই সুমধুর গন্ধ।"

বন্ধু তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বিব্রত করাতে লক্ষ্মী তাকে আগাগোড়া ঘটনা খুলে বলল। সব কিছু বলার পরে লক্ষ্মী তার বন্ধুকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল যেন সে কাউকে এই গোপন কথা না বলে।

বন্ধুটি প্রতিজ্ঞা করল বটে কিন্তু এ রকম রসালো গল্প না বলে থাকতে পারল না। সেও তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুকে অন্য কাউকে না বলার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে কথাটা বলে ফেলল। কথা দেওয়া সত্ত্বেও সে তার বন্ধুর কাছে এই গোপন কথা বলে ফেলল। এইভাবে শঙ্করের গোপন কথা শহরের সমস্ত স্ত্রীলোকেই জেনে গেল। স্ত্রীলোকদের কাছ থেকে তাদের স্বামীরাও জানল। ক্রমশঃ শহরের সবাইকার কানেই এই কথা পৌঁছে গেল।

একদিন সকালে শহরের সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ দল বেঁধে শঙ্করের বাড়িতে

হাজির হল। সবাই মিলে শঙ্করকে চেপে ধরল, শঙ্কর যেন তাদের সবাইকে এর পরের বারে স্বর্গে যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যায়।

শঙ্কর তার বৌ-এর বোকামিতে ভীষণ চটে গেল, কিন্তু অন্য কোনও উপায় না দেখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে রাজি হল। শঙ্কর বলল, "সবাই আজ রাতে রাজার বাগানে জড়ো হতে পার, কিন্তু সকলকে নিঃসাড়ে দাঁড়াতে হবে সেখানে।"

সেই রাত্রে রাজার বাগানে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। বাগানে গাছ-পালার চেয়ে বেশি মানুষ। গাছ-পালা যদিও হাওয়ায় দুলছিল কিন্তু মানুষগুলো যেন সব পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিল। যখন ঐরাবত এল তখনও কেউ নড়ল না বা টুঁ শব্দটিও করল না।

ভোর হতেই শঙ্কর সকলকে নিঃশব্দে হাতছানি দিয়ে ডাকল। তারপরে সে নিজে দৌড়ে গিয়ে হাতির ল্যাজটা জাপ্‌টে ধরল। লক্ষ্মী এগিয়ে গিয়ে তার স্বামীর পা ধরল, লক্ষ্মীর বন্ধু লক্ষ্মীর পা ধরল, লক্ষ্মীর বন্ধুর স্বামী তার স্ত্রীর পা ধরল, তার পরের লোক তার পা ধরল, তার স্ত্রী তার পা ধরল—এইভাবে একে অন্যের পা ধরাধরি করতে লাগল। যখন সাদা হাতিটি আকাশের দিকে উঠল তখন মনে হচ্ছিল যেন স্ত্রী-পুরুষের একটা লম্বা শিকল হাতির পিছন পিছন স্বর্গের দিকে উড়ে চলেছে, একে অন্যের পা প্রাণপণে জাপটে ধরে।

যাত্রার সময় সারির সবশেষের স্ত্রীলোকটি তার কৌতূহল কিছুতেই চেপে রাখতে পারল না। সে তার স্বামীকে বলল, "লক্ষ্মী আমাদের বলেছিল স্বর্গের ফল ও ফুল খুব বড়, কিন্তু ঠিক কত বড় সে তো বলেনি। তুমি তোমার বন্ধুকে একবার জিজ্ঞাসা কর না।"

তার স্বামী তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করল, বন্ধুটি তার স্ত্রীকে, আর এই-ভাবে প্রশ্নটা শেষ পর্য্যন্ত লক্ষ্মীর কাছে গিয়ে পৌছল। লক্ষ্মী তার স্বামীকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে শঙ্কর সংক্ষেপে উত্তর দিল, "স্বর্গে গিয়ে যে যার নিজের চোখেই দেখবে।"

কিন্তু যে স্ত্রীলোকটি লক্ষ্মীর পা ধরেছিল সে ভীষণ অধীর হয়ে পড়েছিল। বারবার ঐ একই প্রশ্ন লক্ষ্মীকে করে যাচ্ছিল। তাই লক্ষ্মীও তার স্বামীকে অনুনয় করে বলল, "আমার বন্ধু আর ধৈর্য্য ধরতে পারছে না, তোমায় এক্ষুনি বলতে হবে স্বর্গের ফল আর ফুল কত বড়।"

এই অধৈর্যপনা দেখে শঙ্কর খুব রেগে গিয়ে বলে উঠল, "প্রত্যেকটা ফল পৃথিবীর ফলের চেয়ে দশগুন বড়। তুমি তো জানো সুপুরিটা এত বড়...."

সুপুরির মাপ হাত দিয়ে দেখাতে গিয়ে শঙ্কর হাতির ল্যাজ দিল ছেড়ে আর...

শঙ্কর থেকে সুরু করে স্ত্রী পুরুষের পুরো সারি হুড়মুড়িয়ে এসে পৃথিবীতে পড়লো। প্রশ্ন করার জন্য কেউই আর বেঁচে রইল না।

দয়ার দান

একদা এক উদার ও দয়ালু রাজা ছিলেন। তিনি সর্বদাই তাঁর প্রজাদের মঙ্গল-চিন্তা করতেন, চাইতেন সবাই সুখে শান্তিতে বাস করুক, কারো মনে যেন কোনো অশান্তি না থাকে। প্রজাদের সত্যিকার অবস্থা যাচাই করবার জন্যে তিনি ছদ্মবেশে শহরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

ছদ্মবেশে ঘুরতে ঘুরতে একদিন তিনি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন। এক চাষী বলদের বদলে তার স্ত্রীকে লাঙ্গলে জুতে দিয়ে খেত চষছে। দেখে রাজার রক্ত গরম হয়ে উঠল। রাগ সামলাতে না পেরে তিনি তেড়ে গিয়ে বললেন, "এটা হচ্ছে কি? তোমার কি বলদ নেই? তুমি এই স্ত্রীলোকটিকে দিয়ে খেত চষাচ্ছ কেন?"

চাষী শান্তভাবে উত্তর দিল, "ও আমার স্ত্রী।"

"তোমার স্ত্রী!" রাজা রাগে ফেটে পড়লেন। "স্ত্রীকে তুমি কি ভাব—দাসীবাঁদী না ভারবাহী পশু?"

"এ কথা তোমার মুখেই সাজে। তোমরা বড়লোক, তোমাদের জুড়ি-গাড়ি আছে, অভাব কি জিনিস— তা তোমরা জান না। আমি এত গরীব হয়ে পড়েছি যে পেট চালাতে বলদগুলো পর্যন্ত বেচতে হয়েছে। কিন্তু আমি চাষী, বাঁচতে গেলে আমাকে জমি চষতেই হবে। তাই

স্ত্রীকে এই কাজে লাগিয়েছি। আর সেজন্যে তার কোন অভিযোগও নেই।"

এই কথায় রাজা মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি জোর দিয়ে বললেন, "আমি এ কিছুতেই বরদাস্ত করব না। তুমি যা কিছুই বল না কেন, একটি স্ত্রীলোককে এইভাবে কাজে লাগানোকে আমি অমানুষিক কাজ বলে মনে করি। হালের বলদ কেনবার জন্যে যত টাকা লাগে আমি দিতে রাজি, কিন্তু তুমি এই মূহূর্তে স্ত্রীলোকটিকে এ কাজ থেকে রেহাই দাও।"

চাষী চটে গিয়ে বলে উঠল, "কে হে তুমি আমাকে এইভাবে হুকুম করবার? তোমার টাকাই বা আমি নিতে যাব কেন? আমি তো আর ভিখিরি নই!"

"আমার বোনকে লাঙ্গল থেকে মুক্তি দাও", রাজা শান্তভাবে অনুরোধ করলেন।

চাষী হো হো করে হেসে উঠল, "পাতানো বোনের জন্যে দরদ যদি এত উথলেই ওঠে, তাহলে তার জায়গাটা তুমিই নাও না কেন? তুমি যদি একাজ করতে রাজি থাকো তাহলে এখুনি আমি আমার স্ত্রীকে ছেড়ে দিচ্ছি।"

রাজা তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন। চাষী আর কোনো উপায় না দেখে নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে রাজাকে লাঙ্গলে জুতে দিল। রাজা লাঙ্গল চষতে লাগলেন। কায়িক পরিশ্রমে তিনি অভ্যস্ত না থাকায় জমির কিছু অংশ খুব খারাপ চষা হল। ফসল পাকলে, দেখা গেল জমির এই অংশের ফসলের শীষ খুব ছোট আর খেলো।

চাষী রেগেমেগে তার বৌকে বলে উঠল, "তোমার পাতানো ভাই-এর কাণ্ডখানা দেখেছ? কাজে ফাঁকি দিয়েছে বলে ফসলের এই হাল।"

কিন্তু ফসল কাটা হলে দেখা গেল, শীষের প্রতিটি কোষে শষ্য-কণার বদলে মুক্তো ফলেছে।
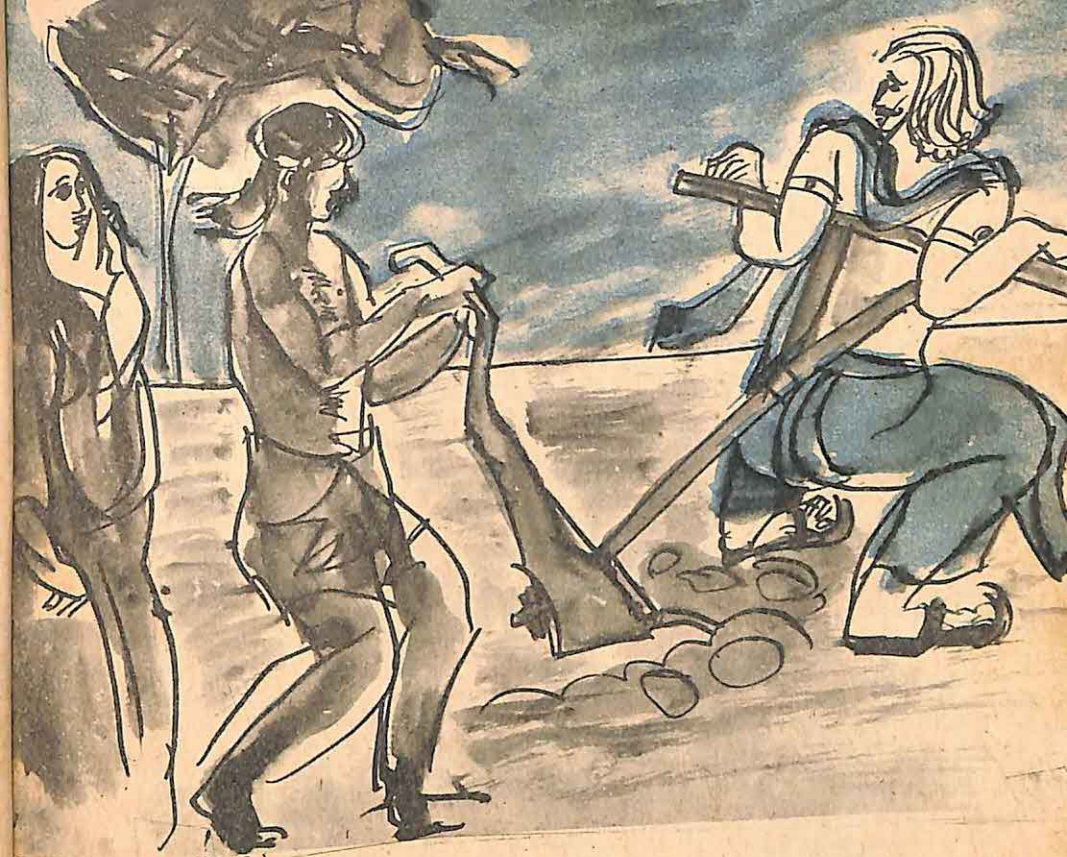
"অযথা তুমি আমার ভাইকে যা তা বললে, দেখ, সে কত ভালো ফসল ফলিয়েছে—মুক্তোর ফসল।" চাষীর বৌ আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠল। চাষীর অনুশোচনা হল।

"তোমার ভাই নিশ্চয়ই যাদু জানে। তার আলৌকিক ক্ষমতা আছে! এ মুক্তো আমরা নিতে পারি না। এইগুলো যে ফলিয়েছে, তারই। তাকেই ফিরিয়ে দিতে হবে।"

"সে কি করে সম্ভব? তুমি তো লোকটির নাম পর্যন্ত জানো না।"

"এ মুক্তো আমাদের নয়। এ আমরা কিছুতেই রাখতে পারি না, আমি এগুলো রাজার কাছে নিয়ে যাব।"

মুক্তোগুলোকে একটা পুটলিতে বেঁধে তারা রাজ-প্রাসাদের দিকে রওনা হল, প্রাসাদে পৌঁছে তারা সোজা রাজ-দরবারে গিয়ে হাজির। দরবারে রাজামশাই তাঁর দু পাশে মন্ত্রী ও সভাসদদের নিয়ে বসেছিলেন।

চাষী আর তার বৌ মুক্তোর পুঁটলি নিয়ে সিংহাসনের দিকে এগিয়ে রাজামশাইকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানাল। প্রণাম সেরে তারা এক সঙ্গে বলে উঠলো, "হে মহারাজ, আমরা······"

কথাটা পুরো না হতেই তারা নির্বাক হয়ে গেল। রাজা আর কেউ নয়, সেই আগন্তুক, যে জোর করে চাষীর বৌকে সরিয়ে নিজেকে লাঙ্গলে জুতেছিল।

চাষী তোতলাতে লাগল, "এ কি! ঐ যে মহারাজ! এঁকেই আমি বলদের মতো খাটিয়েছি! আমার ক্ষমা নেই।"

তারপর সে হেঁট হয়ে রাজার পায়ের ওপর বারবার মাথা খুঁড়তে লাগল। "হে মহারাজ, আমায় ক্ষমা করুন, আমি মহা ভুল করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।"

রাজামশাইও তাদের চিনতে পেরে সামান্য একটু হেসে বললেন, "তোমরা ক্ষমা চাইছ কেন? আমার প্রজাদের যে কি সমস্যা সেটা জানবার সুযোগ তোমরাই আমাকে দিয়েছ। তোমাদের সাহায্য করতে পেরে সত্যিই আমি খুব খুসি।"

মুক্তোর পুঁটলিটা রাজামশাই-এর পায়ের কাছে রেখে চাষী বলল, "আপনার চষা জায়গ'তেই এই মুক্তোগুলো ফলেছিল, এগুলো আমাদের নয়। দয়া করে এগুলো আপনি পারিশ্রমিক হিসেবে গ্রহণ করুন।"

রাজামশাই রা'জি হলেন না। তিনি বললেন, "এই মুক্তো তোমাদেরই—তোমাদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি আর দিন-রাত্তির মেহনতের ফল।"

চাষী তবুও কিছুতেই মুক্তোগুলো নিতে রাজি হল না, বলল, "আপনার ভালবাসা ও সহানুভূতির জোরেই এ মুক্তো ফলা সম্ভব হয়েছে, আমার মতো হৃদয়হীন লোকের এ কাজ নয়।"

রাজামশাই এবার মুক্তোর পুঁটলিটা তুলে নিয়ে চাষীর বৌ-এর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আমি তোমাকে বোন বলে সম্বোধন করেছি। আমার উচিৎ তোমাকে ভাই-ফোঁটার উপহার দেওয়া। তুমি কি দয়া করে ভায়ের এই সামান্য উপহারটুকু নেবে?"

চাষী বা তার বৌ কেউই উপহারটি আর ফেরৎ দিতে পারল না। এই ভাবেই বিবাদ মিটে গেল।

দূরদর্শী বণিক

একদা বারাণসীতে মোহন ও সোহন নামে দুই ব্যবসাদার বাস করত। মোহন খুব বুদ্ধিমান ও ধূর্ত ছিল। টাকা রোজগারের কোনো সুযোগই সে ছাড়ত না। এই ভাবেই সে প্রচুর টাকা উপার্জন করেছিল। কিন্তু সোহন বোকা ছিল, যদিও সে নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করত।

একদিন মোহন ঠিক করল যে সে বাণিজ্যে যাবে। হরেক রকমের দামী দামী জিনিস কিনে সে পাঁচশো গরুর গাড়িতে বোঝাই করল। সোহনের কাছে যখন এই খবর গিয়ে পৌঁছল তখন সে মনে মনে ঠিক করল যে সেও বাণিজ্যে বেরুবে আর মোহনকে তার ব্যবসা বুদ্ধি দিয়ে হারাবে।

সোহনের কিন্তু বেশি টাকা পয়সা ছিলো না। ধার ধোর করে সে সমস্ত জিনিসপত্তর কিনল। আর পাঁচশো গরুর গাড়িও ধার করে মালেতে বোঝাই করল।

সোহন বাণিজ্যে যাচ্ছে শুনে মোহন বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল। সোহনকে গিয়ে সে বললে, "যদি আমরা একই দিকে রওনা হই, তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা একসঙ্গে না গিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে যাই। একহাজার গরুর গাড়ির ভার সইতে পারে রাস্তা এত মজবুত নয়। তা ছাড়া, গ্রামবাসীরা, যারা আমাদের আশ্রয় ও আহার দেবে,

তাদের ওপরেও এটা জুলুম হয়ে দাঁড়াবে। তাই আমাদের আলাদা ভাবেই যেতে হবে। তুমি ঠিক কর, আগে তুমি যাবে, না, আমি।"

সোহন এই কথা শুনে খুব খুশি হল। মনে মনে ঠিক করল সে নিজেই আগে যাবে। কেন না, রাস্তা পরিষ্কার থাকবে, বলদগুলো তাজা ঘাস খেতে পারবে, তার লোকজনেরাও পথে ভাল খাবারদাবার ও আদর যত্ন পাবে। এছাড়া সে যখন শহরে পৌঁছবে, সবার আগে সে-ই বাজারে প্রথম বেচা-কেনা করতে পারবে।

ঠিক এই একই চিন্তা মোহনেরও মাথায় এল। ভেবেচিন্তে সে
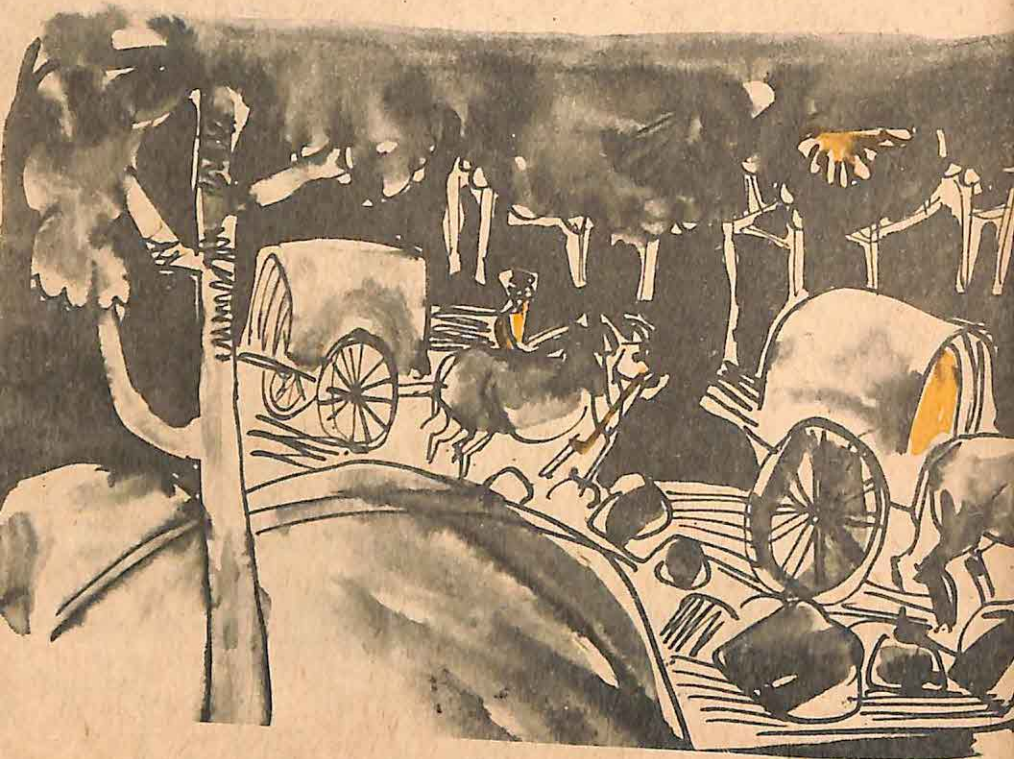
ঠিক করল কিন্তু অন্যরকম। তাই সোহন যখন জানাল যে সে প্রথম যেতে চায়, বিনা দ্বিধায় মোহন তা মেনে নিল।

মাল বোঝাই পাঁচশো গরুর গাড়ি আর দলবল নিয়ে সোহন বাণিজ্যে বেরুল। মনের আনন্দে সোহন গান ধরল আর রাতারাতি বড়লোক হবার স্বপ্নে মশ্‌গুল হয়ে রইল। কিন্তু তার স্বপ্নের ঘোর একটু পরেই কেটে গেল। রাস্তা খুবই এবড়ো খেবড়ো, বড় বড় গর্তে ও পাথরে ভরা ছিল। গর্ত বুজিয়ে আর পাথর সরিয়ে গরুর গাড়িকে পথ করে নিতে হল। গ্রামের লোকেরা এ ব্যাপারে তাকে অনেক সাহায্য

করেছিল। তার বদলে সোহনকেও এইসব লোকেদের খাবার ও মজুরীর ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। এতে খরচও বাড়ল অনেক, দেরিও হল প্রচুর। এইভাবে রাস্তা ঠিক করতে করতে সোহন এগিয়ে চলল। শীগ্‌গিরই তারা একটা ঘন জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়ল। গাড়ি এগুবার জন্যে গাছ-পালা কেটে রাস্তা করতে হল। বনেতে অনেক বাঘ, সিংহ, চিতা ও নেকড়েবাঘ ছিল। অন্ধকারে যখন সবাই সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছে তখন বনের এইসব হিংস্র জন্তুরা এসে অনেক বলদ মেরে ফেলল।

সোহন ও তার লোকজনেরা ক্লান্তি আর হতাশায় মুষড়ে পড়ল। যখন তারা বাড়ি ফিরে যাবে, না, আরো এগুবে এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে বাকবিতণ্ডায় ব্যস্ত, সেই সময় সোহন সামনের রাস্তা দিয়ে একটা গরুর গাড়িকে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখল। সাদা বলদে এই গাড়িটা টানছিল। এতে ছ'জন লোক ছিল। তাদের জামা কাপড় ভিজে একেবারে সপ্‌ সপ্‌ করছিল, আর তাদের গলায় সাদা পদ্মের মালা ছিল।

সোহন তাদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করল, "যে পথ দিয়ে আপনারা এলেন, সেই পথ সম্বন্ধে আমাকে কি কিছু বলতে পারেন? এই পথে আহার আর জল কি প্রয়োজন মতো পাওয়া যাবে?"

শুনে সবাই একবাক্যে বলে উঠল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমাদের পোষাকের দিকে দেখুন কি রকম ভেজা! গাড়ির চাকায় কি রকম কাদা, দেখতে পাচ্ছেন না? ঐ দিকে খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে, সবুজ খেতে ফসল ফলে আছে অফুরন্ত।"

সোহনের গাড়িতে জলের বড় বড় ঘড়া দেখে লোকগুলো হেসেই অস্থির। জিজ্ঞাসা করল, "আপনারা এত জল কেন নিয়ে যাচ্ছেন? মিছিমিছি আপনারা বোঝা বাড়িয়েছেন। আপনাদের সবায়ের জল, খাবার আর বলদের খড়-বিচালি সব ফেলে দিয়ে বোঝা হাল্কা করে নিন।"

সোহন করলও তাই। বোঝা হাল্কা হওয়ায় গরুর-গাড়িগুলো বেশ কিছুক্ষণ জোরে ছুটে চলল। সোহন কখন সবুজ খেত-খামার দেখতে পাবে সেই আশায় উদগ্রীব হয়ে রইল। কিন্তু যতই তারা এগুতে লাগল আশেপাশের জায়গাগুলো ততই শুকনো ও কাঠফাটা বলে মনে হতে লাগল। দেখতে দেখতে সোহনের দলবল এসে পড়ল এক মরুভূমিতে। চারিদিকে কেবল বালি আর বালি।

অনাহারে আর তৃষ্ণায় বেশ কিছু লোক আর বলদ মারা পড়ল। বাকি যারা রইল তারা প্রায় মরো মরো অবস্থায় কোন রকমে এগিয়ে যেতে লাগল। সুযোগ বুঝে আগন্তুকেরা, যারা আসলে ঠগ, সোহনের দলবলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকজনেদের মেরে, বলদগুলো আর অন্য যা জিনিস পেল নিয়ে, তারা সরে পড়ল। সোহন কোনমতে তার দু' একজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সোহন আর তার বন্ধুরা অনেক কষ্টে সহরে পৌছল। সামান্য যা কিছু জিনিসপত্তর তারা বাঁচিয়ে আনতে পেরেছিল, তা খুব কম দামে বেচে দিল। এখানকার দর তাদের জানা ছিল না। আর এদের এই অবস্থা দেখে শহরের লোকেরাও ঠিক দাম দিল না।

সোহন হতাশ ও মনমরা হয়ে দেশে ফিরল। এদিকে মোহনও তার দলবল নিয়ে যাত্রা সুরু করল। সোহন আগেই পথ পরিষ্কার করে রেখে গেছে। কাজেই মোহনের এগুতে কোনো কষ্টই হল না। বনের পথও পরিষ্কার ছিলো। বনের জন্তুরা ভয় পেয়ে আগেই সব পালিয়ে গিয়েছিল।

পথে মোহনেরও সেই ঠগেদের সঙ্গে দেখা হল। আগের মতো এবারেও তারা মোহন ও তার দলবলকে লোভ দেখাল, তাদের জল আহার সব ফেলে দিয়ে গরুর-গাড়িগুলোকে হালকা করে নিতে বলল। কিন্তু মোহন খুব চালাক। সে নিজের দলবলকে ঠগেদের কথায় বিশ্বাস করতে বারণ করল। সামনের খেত-খামার শুকনো হবে বলেই মোহনের মনে হল।

ঠগগুলো ভিজে কাপড়জামা আর পদ্মের মালা গলায় দিয়েছে কিন্তু কোথাও বৃষ্টির চিহ্নমাত্র মোহন দেখতে পেল না। আকাশও পরিষ্কার, কোথাও মেঘ ছিল না। মোহনের মনে হল এই লোকগুলো তাদের ঠকাতে চায়।

মোহন ঠগেদের কথায় কান না দিয়ে এগিয়ে চলল আর কিছুদূর যেতে না যেতেই মরুভূমির ভেতর গিয়ে পড়ল। প্রচুর জল ও খাবার থাকাতে মরুভূমি পার হতে কোন কষ্ট হল না তাদের।

শহরে পৌঁছে সেখানকার দর যাচাই করবার প্রচুর সময়ও মোহন পেল। বেশ ভালো দামে সব জিনিসপত্তর বিক্রি করে মোহন মনের আনন্দে দেশে ফিরল।
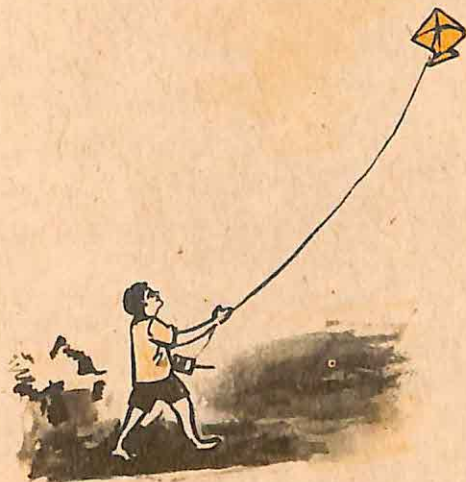
প্রসাদ

দক্ষিণ ভারতের একটি ছোট্ট গ্রামে এক গরীব চাষী বাস করত। তার দুটি সন্তান—উমা আর গোপাল। উমা আট বছরের মেয়ে আর গোপাল ছোট্ট ছেলে। যখন চাষীর বৌ মারা যায় তখন উমা তার ভাইয়ের দেখাশোনার সব ভার নেয়।

কয়েক বছর পরে চাষীও মারা যায়। দুটি ভাইবোনই অনাথ হয়।

বয়সের অনুপাতে উমা ছিল বেশ বুদ্ধিমতী। সে বুঝত যে তাকে মা-বাবা দুয়েরই স্থান পূরণ করতে হবে। সংসারও তাকে চালাতে হবে। লাঙ্গল দিয়ে সে খেত চাষ করত। খেতে সার দেওয়া, বীজ পোঁতা, জল দেওয়া আর সবশেষে ফসল কাটা—সব কিছুই তাকে করতে হত। উমার এই সাহসের জন্যে পাড়া প্রতিবেশী সবাই তার সুখ্যাতি করত, তাকে কাজে সবাই সাহায্যও করত। ভালো চাষবাস করতে পারত বলে তার নিজের আর ভাই-এর খরচের জন্যে তাকে ভাবতে হত না।

অনেক বছর কেটে গেছে। গোপাল পড়াশুনা শেষ করেছে। একদিন সে দিদিকে বলল, "আমাকে মানুষ করতে গিয়ে তুমি তোমার যৌবনের বেশির ভাগ সময়ই কাটিয়ে দিয়েছ। বিয়ে-থা করলে এতদিন

তোমারও সংসার হত। মেয়ের বিয়ের খরচও অনেক, আমাদের সে টাকা নেই। তোমার বিয়েতে যৌতুকও দিতে পারব না।”

উমা কিন্তু একথায় কানই দিল না। গ্রামের একটি যুবক উমাকে ভালবাসত। সে একদিন গোপালের কাছে এসে উমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব জানাল। আরো জানাল যে সে কোন পণ চায় না। উমার নিঃস্বার্থ কাজ আর অসীম সাহসই তার কাছে পণের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান।

বিয়ের দিন পাকা হল। উমার বিয়েও হয়ে গেল। শ্বশুর-বাড়ি যাবার আগে উমা ছোট ভাইকে বলল, “তুইও তাড়াতাড়ি বিয়ে কর। শ্রাবণ মাসের প্রথম শুক্রবারে লক্ষ্মী পূজোর যে প্রথা চলে আসছে তা তুই বজায় রাখবি। তুই কথা দে যে তোর বৌকে দিয়েও তুই এই পূজো চালিয়ে যাবি।” কোনো দ্বিধা না করেই দিদির এই সামান্য অনুরোধ-টুকু রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিল গোপাল।

এরপর অনেকদিন কেটে গেছে। গোপালের অক্লান্ত পরিশ্রমে তার ধানের গোলা ভরে উঠেছে। সে এক বড়লোক চাষীর আদুরে সুন্দরী মেয়ে কমলাকে বিয়ে করল।

কয়েক সপ্তাহ পরেই শ্রাবণের সেই পূণ্যতিথি এল। সমস্ত গ্রামময় সাড়া পড়ে গেল লক্ষ্মীপূজোর, বিশেষ করে যাদের বাড়ি আবার নতুন বৌ এসেছে। এই পূজোর দিনে বিশেষ করে মেয়েদেরই নেমন্তন্ন হত। বিবাহিতা মেয়েদের আর বোনেদের সবচেয়ে বেশি সমাদর এইদিনে। লোকেরা ভাবত মেয়েদের শুভ কামনায় গৃহের কল্যাণ আর অভিশাপে অমঙ্গল হয়। গোপাল তার প্রতিশ্রুতির কথা স্ত্রীকে বলল। কমলা এক শর্তে মহা ধূমধামে লক্ষ্মীপূজো করতে রাজি হল। কমলার শর্ত, গোপাল তার দিদিকে আমন্ত্রণ করতে পারবে না এই পূজোয়। কমলা বললে, “উমা গরীব, সে এখানে আসবে তার ছেঁড়াখোঁড়া জামাকাপড় পরে আর এক পাল ল্যাংটা ছেলেপুলে নিয়ে। এতে আমার লজ্জায় মাথা কাটা

যাবে আর আমার বাপের বাড়ির লোকেরাও জানতে পারবে যে তোমার অনেক গরীব, নিঃসম্বল আত্মীয় স্বজন আছে।"

গোপাল তাতেই রাজি হল। সে বড়লোক সুন্দরী বৌকে অসন্তুষ্ট করতে চাইল না। তাই উমাকে আর নেমন্তন্ন করা হল না।

শ্রাবণের প্রথম শুক্রবার। গোপালের বাড়িতে অনেক লোকের সমাগম। ধূপ আর ফুলের সুগন্ধে বাড়ি ভরপুর। রান্নাঘর থেকে সুগন্ধ ভেসে আসছে। সুস্বাদু নানান্ রকম রান্নাবান্না করার জন্যে নাম-করা রাঁধুনিদের আনা হয়েছে। নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে, ফুলের মালা পরিয়ে, গায়ে গোলাপ জল ছিটিয়ে দিয়ে। তাদের হাতে পান ও নারকেল ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

উৎসব যখন পুরোদমে চলছে, উমা তখন এসে হাজির। ওকে দেখেই কমলার সুন্দর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। রূপোর একটা বড় পাত্র করে কমলা ঘরের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে প্রসাদ বিতরণ করছিল। উমা ভেতরে এসেই কমলাকে জড়িয়ে ধরল। নিজেই নিজের প্রসাদ নিয়ে সে কমলাকে বলল, "তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। আমার ভাই কোথায়? সে তার কথা রাখতে পেরেছে জেনে সত্যি আমি খুব খুসি। তোমরা নিশ্চয়ই আয়োজন নিয়ে খুব ব্যস্ত, তাই আমাকে বলতে ভুলে গেছ। আর সত্যিই তো, আমি তো আর অতিথি নই। নিজের ভায়ের বাড়িতে আসবো তাতে আবার নেমন্তন্ন কিসের।"

উমা মনের আনন্দে অনর্গল কথা বলে চলেছে। সকলে চুপ করে তাকিয়ে দেখছিল—সে খেয়ালই তার নেই। কমলার বড়লোক বন্ধুরা মুখ টিপে টিপে হাসছিল। কমলার ভীষণ অপমান বোধ হচ্ছিল। গোপালেরও লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল।

এইভাবে সাতটি বছর কেটে গেল। প্রত্যেক বছরেই কমলা খুব ধূমধামের সঙ্গে লক্ষ্মীপূজো করত। শ'য়ে শ'য়ে অতিথি এসে খেয়ে-দেয়ে আনন্দ করে যেত। উমাকে কখনই ডাকা হত না। কিন্তু
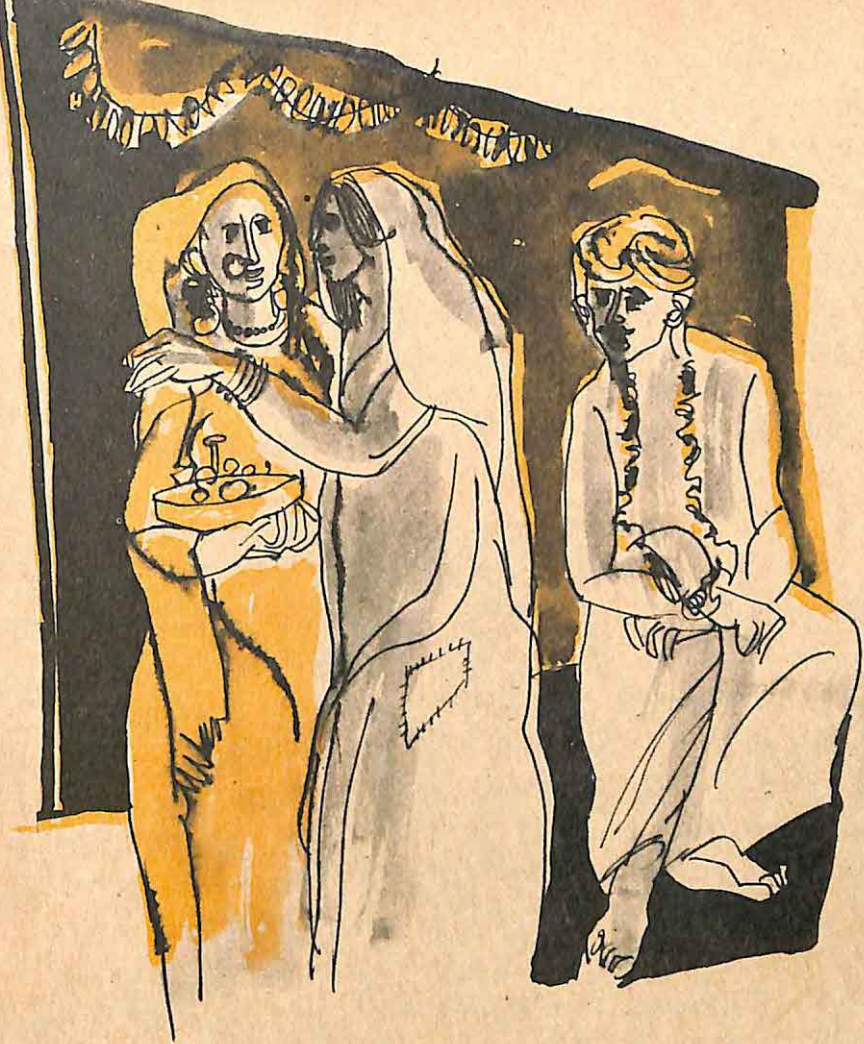
প্রত্যেকবারেই সে আসত। সে তার ছেঁড়া তালি দেওয়া কাপড় পরেই আসত, কলাপাতায় প্রসাদ নিয়ে সানন্দে গোপাল আর কমলার সঙ্গে কথাবার্তা বলে, তাদের আশীর্ব্বাদ জানিয়ে ফিরে যেত। গোপাল আর কমলা প্রতি বছরই উমার এই ব্যবহারে খুব বিব্রত বোধ করত।

উমার স্বামী সংসার চালাবার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করত। উমা

অল্পতেই সন্তুষ্ট ছিল। আস্তে আস্তে তার স্বামীর ব্যবসার উন্নতি হতে লাগল। ধীরে ধীরে রোজগারও বাড়তে লাগল। তাদের অবস্থা ফিরে গেল। উমার বিরাট বাড়ি ও অনেক দাস দাসীও হল। রেশমী কাপড় পরে, চার চারটে সাদা ঘোড়ার গাড়ি হাঁকিয়ে সে বেড়াতে যেত।

গোপাল আর কমলা উমার ঐশ্বর্য্যের কথা শুনল। শ্রাবণ মাস এলে কমলা গোপালকে বলল, "এবারে দিদির বাড়ি গিয়ে তাঁদের সকলকে পূজোয় আসার জন্যে বলে এসো। খালি হাতে যেও না। কিছু মিষ্টি আর নারকেল নিয়ে যেও। হাজার হোক সে তোমার বড় বোন।"

গোপাল নিজে গিয়ে উমাকে নেমন্তন্ন করে এল। উমা ভাইকে আদর-আপ্যায়ন করে পূজোয় যাবে কথা দিল।

পূজোর দিন এল। অতিথিরা আসতে লাগল, মন্ত্রপাঠ ও ভজন পূজন হল। সারা বাড়ি ফুলের আর কর্পূরের গন্ধে ভরে উঠল। হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। সুন্দর একটা ঘোড়ার গাড়ি ফটকে এসে দাঁড়াল। সবাই নির্বাক হয়ে সেদিকে চেয়ে দেখল। একটা চাকর কোচবাক্স থেকে নেমে গাড়ির দরজা খুলে দিল। ঝকমকে হীরের গয়না আর সোনালী বেনারসী শাড়ী পরে এক মহিলা গাড়ি থেকে নেমে সন্তর্পণে বাড়ীর দিকে এগুল। উমাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে কমলা ননদকে চিনতেই পারছিল না। দিদিকে সাদর আহ্বান জানিয়ে কমলা এক পাশে সরে গিয়ে উমার ভেতরে যাবার পথ করে দিল। গোপাল তাকে একটা আরাম কেদারায় বসতে দিল। কমলা দৌড়ে গিয়ে একখানা রূপার রেকাবীতে নানারকমের মিষ্টি এনে সামনে ধরল। উমা একটু হেসে গোপালকে আরো একটা চেয়ার আনতে বলল।

গোপাল ছুটে গিয়ে একটা গদি আঁটা চেয়ার নিয়ে এল। উমা

তার সোনালী কাজ করা গায়ের চাদরটা খুলে পাশের চেয়ারে রাখল। গোপাল ভাবল হয়তো বা উমার গরম লাগছে। সে ফিশ ফিশ করে কমলাকে একখানা পাখা আনতে বলল।

কমলা দৌড়ে গিয়ে পাখা এনে উমার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে ধীরে ধীরে বাতাস করতে লাগল।

উমা একে একে তার গয়না খুলে পাশের চেয়ারটায় রাখতে লাগল। দিদিকে গোপাল জিগ্যেস করল, "এই গয়নাগুলো কি দিদি তোমার ভারি লাগছে?"

উমা কোনো উত্তর দিল না। সব গয়না খোলা হলে সে একটা

একটা মিষ্টি তুলে প্রত্যেকটি গয়নার ওপর রাখতে লাগল। সবাই আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল।

গোপাল বিরক্ত হয়ে বলল, "দিদি, একি করছ?" উমা হেসে উত্তর দিল, "মিষ্টিগুলো আসলে যাদের প্রাপ্য আমি তাদেরই দিচ্ছি। এ বিরাট ভোজ তুমি আমাকে দাওনি। আমার সুন্দর কাপড় ও গয়নাকে দিয়েছ। আমি তো কলাপাতার সামান্য প্রসাদেই সন্তুষ্ট—যা তোমরা এতদিন আমাকে ও আমার ছেলে-পুলেদের দিয়ে এসেছ।"

ঘরের সবাই নিস্তব্ধ হয়ে রইল। খানিক পরে অতিথিরা পরস্পরে মুখ চাওয়া-চায়ি করে, গোপাল ও কমলার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ফিশফিশিয়ে কথা বলতে লাগল। গোপাল ও কমলা দুজনেই লজ্জায় মাটিতে মিশে গেল।

উমা ওদের দুজনকে ভর্ৎসনার সুরে বলল, "ভালবাসার সঙ্গে টাকাকড়ির কোনও যোগ নেই। ছেঁড়া কাপড়ই পরি আর দামী বেনারসী শাড়ীই পরি, তোমাদের আমি সব সময়-ই আশীর্ব্বাদ করব। তোমরা সুখে শান্তিতে থাক এই কামনাই করি।"

পৃথিবীর সবচেয়ে নরম বিছানা

বহুকাল আগেকার কথা। এক রাণী ছিলেন, নাম তাঁর মীনাক্ষী। তাঁর সব সময় মনে হত, তাঁর ভালো ঘুম হয় না। সারারাত তিনি বিছানায় ছট্‌ফট্ করতেন। তাই মেজাজও ছিল তাঁর খিটখিটে। সুন্দর মুখ-খানা সব সময় গোমড়া হয়ে থাকত। একই অভিযোগ ছিলো যে তাঁর বিছানা নরম নয়, তাই তিনি ঘুমতে পারেন না।

রাজা তাঁর চাকরদের অনেক দূর দূর দেশে পাঠিয়েছিলেন। তারা সবচেয়ে নরম তুলো নিয়ে এল। রাজার প্রধান দরজি সুন্দর, সূক্ষ্ম রেশমী কাপড় দিয়ে রাণীর জন্যে চমৎকার গদি তৈরি করে দিল। মীনাক্ষী তাতেও সন্তুষ্ট হলেন না। "এটাও খুব শক্ত। এর থেকেও নরম গদি না হলে আমি অসুখে মারা পড়ব। কোনও মানুষ না ঘুমিয়ে বাঁচতে পারে না।"

রাজামশাই অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি ক্ষোভে দুঃখে একেবারে হতাশ হয়ে পড়লেন। বাগানে পায়চারি করতে লাগলেন। প্রধান মন্ত্রী তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বললেন, "হে মহারাজ, আমি ভেবে চিন্তে একটা উপায় ঠিক করেছি। রাণীমাকে সন্তুষ্ট করার মতো নরম বিছানা আমি জোগাড় করতে পারব।"

রাজামশাই মহানন্দে মন্ত্রীকে সব খুলে বলতে বললেন।
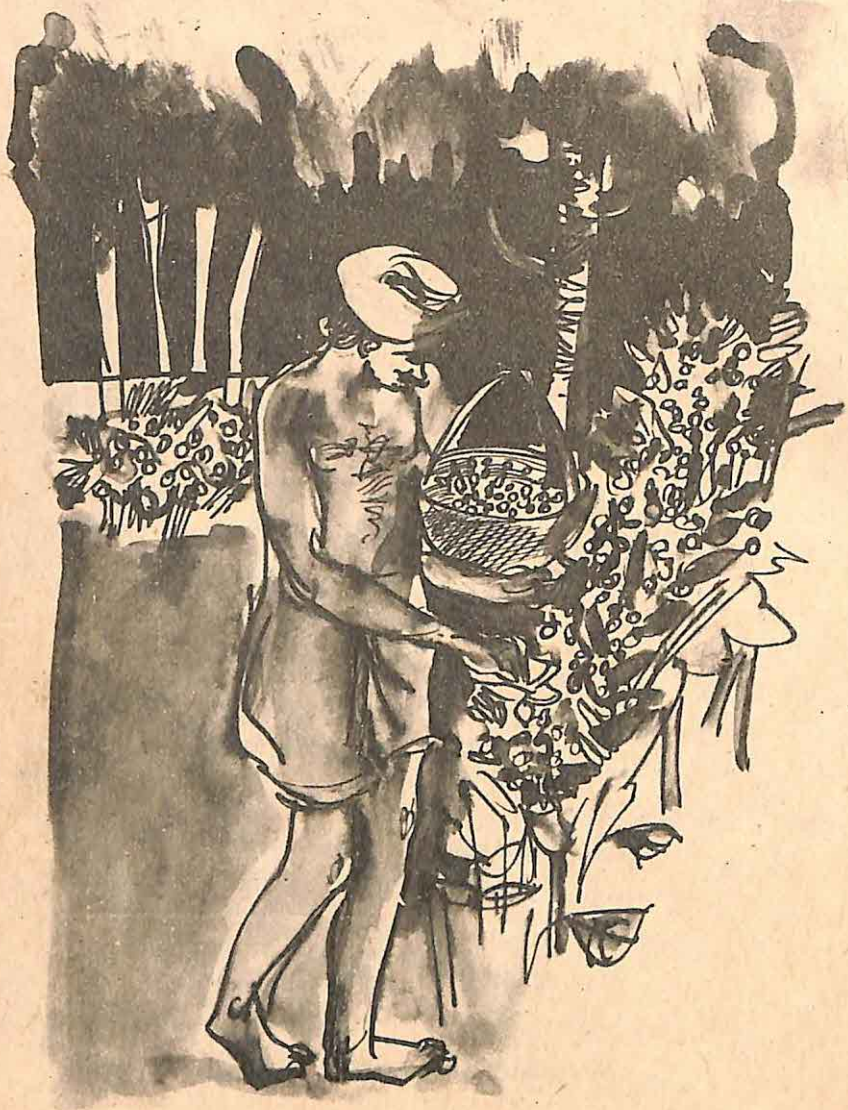
"হে মহারাজ, এই বাগানে হাজার রকমের ফুল আছে। এখানে যুঁই, চামেলী আর বেলফুল ফুটে আছে, দুধের চেয়ে সাদা আর তুলোর চেয়েও নরম। মালীদের বলব, রোজ সন্ধ্যায় এইসব ফুলের কুঁড়ি ফোটার আগেই যেন তুলে নেয়। এর থেকে আমরা সবচেয়ে মোলায়েম কুঁড়িগুলো বেছে নিয়ে রাণীমার বিছানায় ছড়িয়ে দেব। এতে বিছানাও নরম হবে আর সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কুঁড়িগুলো ফুটে গন্ধে সারা ঘর মাতিয়ে দেবে। আমার বিশ্বাস রাণীমা এতে খুসি হবেন।"

রাজামশাই রাজি হলেন। পরের দিনই প্রধান মালীকে আদেশ দেওয়া হল। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ভালো ভালো কুঁড়ি তুলে আনা হোল। রাণীর দাসীরা সেগুলো তাঁর বিছানায় পুরু করে ছড়িয়ে দিল। সে রাত্রে রাণীমা খুব আরামে ঘুমলেন। রাজামশাই সন্তুষ্ট হয়ে মন্ত্রীকে তার বুদ্ধির জন্যে পুরস্কার দিলেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় কুঁড়ি তুলে রাণীমার বিছানায় ছড়ানো হত। রাণীমার মুখের চেহারা ফিরে গেল। মুখে আবার হাসি ফুটল। রাজা খুব খুসি হলেন, আর নিশ্চিত হলেন যে তাঁর সমস্যার এত দিনে বুঝি একটা সমাধান হল।

এর কিছুদিন পরেই হঠাৎ একদিন ভোরবেলা রাণীমার ঘর থেকে চীৎকার শোনা গেল। দাসীরা উঠেপড়ে তাঁর ঘরের দিকে ছুটল। গিয়ে দেখে, রাণীমা তাঁর বিছানায় উঠে বসে পিঠে হাত বোলাচ্ছেন আর রাগে কাঁপছেন।

রাজামশাইও ছুটে গিয়ে জানতে চাইলেন, কি ব্যাপার? দাসীরা তো ভয়ে থরহরি কম্পমান!

মীনাক্ষী রেগে মেগে জিগ্যেস করলেন, "কাল রাত্তিরে কে আমার বিছানা পেতেছিল?"

দাসীরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। একজন ভয়ে ভয়ে আস্তে করে বলল, "আমরা সকলে মিলেই পেতেছিলুম, রাণীমা।"

রাণীমা অত্যন্ত বিরক্তিতে বললেন, "তাই বুঝি? যাক, তোমরা নিজেদের দোষ স্বীকার করেছ জেনে আমি খুব খুসি হয়েছি। তোমাদের কাজে গাফিলতি হয়েছে। আমার বিছানায় নিশ্চয় কিছু শক্ত জিনিস ছিল যার ফলে আমার পিঠে কালশিরা পড়েছে। কাল রাত্তিরে আমি একটি বারও চোখের পাতা এক করতে পারিনি।"

দাসীরা তাঁকে আশ্বস্ত করে বলল তারা খুব মন দিয়েই বিছানা পেতেছিল। কিন্তু রাণীমা সে কথা বিশ্বাস করলেন না। রাজামশাই বিছানা উল্টে ভালভাবে দেখে, কালশিরা পড়ার কি কারণ তা' তাঁকে জানাতে বললেন।

বিছানা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। প্রত্যেকটি ফুল দেখা হল। ফুলের গাদার মধ্যে শেষ পর্যন্ত একটি না-ফোটা কুঁড়ি পাওয়া গেল।

রাজামশাই তো রেগেই আগুন। ভালভাবে কুঁড়ি বাছাই না করার জন্যে তিনি দাসীদের ভর্ৎসনা করলেন। রাগের মাথায় তাদের সবাইকে তাড়িয়েও দিলেন। প্রধান মালীকেও রাজামশাই বরখাস্ত করলেন।

রাণী কিন্তু এসবেতে মোটেই খুসি হলেন না, তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "আমি এক মুহূর্তও আর এখানে থাকব না। আমার ভায়ের কাছে চলে যাব।"

রাজামশাই, প্রধানমন্ত্রী আর সভাসদেরা রাণীমার মত বদলাবার অনেক চেষ্টা করলেন। তাঁকে থাকার জন্যে বহু অনুনয় বিনয় করলেন। কিন্তু তিনি কারো কথাই শুনলেন না। অগত্যা রাজামশাই তাঁর যাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। রাণীমার ভাই সাতসমুদ্রের পারে থাকতেন,

দূরের পথ, বিপদও ছিল অনেক। রাজামশাই এক বিরাট জাহাজ তৈরি করালেন। রাজবাড়ির দশবারোজন দাসদাসী সঙ্গে দিলেন। তিনি নাবিকদের খুব সাবধানে যাবার নির্দেশ দিলেন। বললেন, রাণীমাকে নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিতে পারলে তিনি তাদের থলে ভর্তি সোনার মোহর দেবেন।

যাত্রার আরম্ভ ভালোই হল। সমুদ্রের ফুরফুরে হাওয়ায় রাণী-মার রাগ ক্রমশঃ পড়ে গেল। তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তাঁর মুখে আবার হাসি ফুটল। কিন্তু ঠিক পরের দিনই সমুদ্রের রূপ পালটে গেল। জাহাজ-ডুবি হল। সকলে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মীনাক্ষী কিন্তু অদ্ভুত ভাবে বাঁচলেন। তিনি প্রাণপণে একটা তক্তা জাপটে ধরে

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভেসে চললেন। শেষে এক অচেনা দেশে গিয়ে তিনি উঠলেন। পুরোপুরি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়া সত্ত্বেও তিনি একটা কুঁড়ে ঘর দেখতে পেয়ে নিজেকে টেনেটেনে সেখানে নিয়ে গেলেন। ঐ কুঁড়েতে এক বুড়ো ও তার স্ত্রী বাস করত।

মীনাক্ষী তাদের নিজের দুর্ভাগ্যের কথা জানালেন কিন্তু নিজে যে রাণী সে কথা চেপে গেলেন। তিনি তাদের কাছে আশ্রয় আর খাবার ভিক্ষা চাইলেন।

তারা রাজি হয়ে বললে, "তুমি যতদিন ইচ্ছে এখানে থাকতে পার। আমরা দুজনেই বুড়ো হয়েছি। আমাদের সাহায্যের জন্যে তোমার মতো অল্প বয়সের মেয়ে আমাদের দরকার।"

বুড়োবুড়ির এতই বয়স হয়েছিল যে তাদের খেটে খাবার আর ক্ষমতা ছিল না। মীনাক্ষী তাদের খাওয়াবার ভার নিতে রাজি হলেন। কাছেই নদীতে একটা বাঁধ তৈরি হচ্ছিল। দলে দলে মজুর সেখানে কাজ করত। মীনাক্ষী ঠিক করলেন, তিনিও তাদের সঙ্গে কাজ করে রোজগার করবেন। কিন্তু তিনি কি এই কঠোর শারীরিক পরিশ্রম সহ্য করতে পারবেন? তাঁর কাছে তো ফুলের বিছানাও শক্ত লেগেছিল! মীনাক্ষী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। কিন্তু এছাড়া আর কোনও উপায় তো নেই। তিনি সেই বাঁধেই কাজ জোগাড় করে অন্যান্য মজুরদের সঙ্গে কাজ করতে সুরু করে দিলেন। সবাইকার মতো তিনিও দৈনিক মজুরী পেতেন। সেই টাকায় বুড়োবুড়ির আর নিজের খরচ চালাতে লাগলেন। তাঁর অতি সামান্য রোজগারে খুব সাধারণভাবে খাওয়া পরা চলত। কিন্তু তিনি কোন অভিযোগ করতেন না। মাটিতে মাদুর পেতে শুতেন। সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর শোওয়া মাত্রই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়তেন।

একদিন সেই দেশের রাজা বাঁধ দেখতে এলেন। কাজ কি ভাবে এগুচ্ছে তাই তিনি দেখতে চান। সেদিন সন্ধ্যায় রাজা নিজেই সকলকে মজুরী দেবেন ঠিক করলেন। যখন মীনাক্ষীর পালা এল তিনি এগিয়ে গেলেন। রাজা বারবার তাঁর দিকে তাকাতে লাগলেন। ছেঁড়াতালি দেওয়া কাপড় পরে থাকা সত্ত্বেও রাজা নিজের বোনকে চিনে ফেললেন।

রাজা এগিয়ে এসে মীনাক্ষীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আনন্দের অশ্রু তাঁদের গাল বেয়ে ঝরে পড়ল। সকলে ভেবেছিল যে মীনাক্ষী অনেকদিন আগেই সমুদ্রে ডুবে মারা গেছেন। কিছুক্ষণের জন্যে আনন্দের স্রোত বইল। রাজা বলে চললেন, "এতদিন তোমার ওপর দিয়ে কত ঝড়ই না বয়ে গেছে, তা' না হলে তোমার এই দৈন্য দশা আর শীর্ণ চেহারা হবে কেন?"

মীনাক্ষী হেসে বললেন, "আমি কোনো কষ্ট পাইনি। এতে আমার অনেক উন্নতি হয়েছে। যখন রাণী ছিলাম, চরম বিলাসিতার মধ্যে জীবন যাপন করেও আমি কখনও সুখী হতে পারিনি। অতি নরম বিছানাতে শুয়েও আমার ঘুম হত না। আমার স্বামী আমাকে সুখী করবার জন্যে কি না করেছেন? কিন্তু কোনো কিছুই আমাকে সুখী করতে পারেনি। বেশির ভাগ লোক কত কষ্টে জীবন কাটায় তা আমি এখন বুঝতে পেরেছি। এদের মতো জীবন যাপন করতে ভাগ্য আমাকে বাধ্য করেছে। আমি কঠোর পরিশ্রম করার পর মাদুরে শুয়ে অঘোরে ঘুমোই। নরম বিছানা চাই বলে এখন আর আমি কোনো অভিযোগ করি না।"

রাজা মীনাক্ষীর স্বামীকে জানালেন যে মীনাক্ষী এখনও জীবিত আছে। রাজামশাই এ খবর পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে স্ত্রীর কাছে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। তিনি জাহাজ বোঝাই করে দামী দামী উপহার সঙ্গে নিলেন এই ভেবে যে মীনাক্ষী এগুলো পেয়ে খুব খুসি হবে। মীনাক্ষী আগের চেয়ে অনেক সুন্দর হয়েছেন দেখে তিনি খুব অবাক হলেন। সব সময়-ই তাঁর হাসি মুখ, খুসি আর তৃপ্তিতে ভরা। রাজামশাই রাণীমার প্রতিদিনের সেই গোমড়ামুখ আর দেখতে পেলেন না।

"তোমায় দেখে মনে হচ্ছে যে আজকাল তোমার বেশ ভালই ঘুম হচ্ছে। তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমার ভাই তোমার মনের মতো নরম

বিছানা জোগাড় করতে পেরেছেন। কোথায় এই অদ্ভুত বিছানা পাওয়া গেল? কি দিয়েই বা তা' তৈরি?"

মীনাক্ষী ছোট্ট করে জবাব দিল, "আমি এখন মাটিতে মাদুর বিছিয়ে ঘুমাই।"
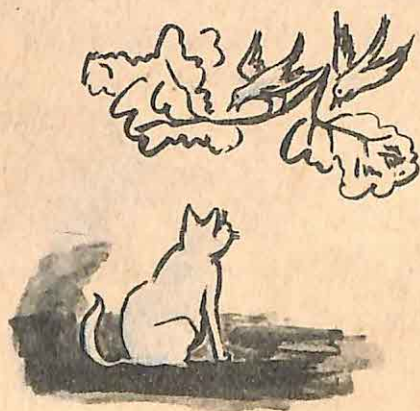
মানুষ ও মরা ইঁদুর

অনেক দিনের কথা। চৌলক্য নামে এক মহাপণ্ডিত বারাণসীতে থাকতেন। একদিন তিনি ভাবে বিভোর হয়ে পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখতে পেলেন রাস্তায় একটা ইঁদুর মরে পড়ে আছে।

বিড় বিড় করে বলে উঠলেন, "কি বিশ্রী দেখাচ্ছে। কিন্তু একেও কাজে লাগানো যায়। যার একটু বুদ্ধি আছে সে এর থেকেও প্রচুর রোজগার কবতে পারে।"

একটি গরীব ছেলে সেই সময় ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তার নাম হরি। সে এই কথাগুলো শুনল। এত বড় দার্শনিকের মুখে একথা শুনে সে ভাবল, নিশ্চয় এটা বাজে কথা নয়। তাই মরা ইঁদুরটা সে তুলে নিল।

ইঁদুরটা নিয়ে সে কি করবে ভাবছিল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে বেড়ালরা ইঁদুর খেতে খুব ভালবাসে। তার পড়শীর বেড়ালের কথাও মনে হল। বাড়িতে ইঁদুর না থাকায় বেড়ালটার ইঁদুর খাওয়া হত না। এই মরা ইঁদুরটা পেলে বেড়ালের খাওয়াটা আজ বেশ জমবে।

এই ভেবে হরি মরা ইঁদুরটা নিয়ে সোজা পড়শীর কাছে গেল। পড়শী ইঁদুরটা পেয়ে খুব খুসি হয়ে হরিকে জিজ্ঞেস করল, "মরা ইঁদুর কোথায় পেলে? ইঁদুরটা আমাকে বিক্রি কর।"

হরি ইঁদুর বেচার পয়সা নিয়ে একটা দোকানে গিয়ে কিছু মিষ্টি কিনল। মিষ্টির ঠোঙ্গা আর এক কুঁজো জল নিয়ে সে সহরতলীর দিকে গেল। একটা বাগান দেখতে পেল, বাগানে ঢোকবার মুখেই একটা বড় বটগাছ, হরি তার তলায় খাবারের ঠোঙ্গা আর জলের কুঁজোটা রেখে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

ঘণ্টাখানেক পরে বাগান থেকে একজন মালী বেরিয়ে এল। সারা-দিনের পরিশ্রমে সে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। হরি তাকে জল আর মিষ্টি খেতে দিল। বুড়ো মালী জল মিষ্টি খেতে পেয়ে খুব খুসি হয়ে হরিকে একটা বড় ফুলের তোড়া উপহার দিল।

হরি এই ফুলগুলো বিক্রি করে আরও কিছু মিষ্টি কিনে আবার ফিরে গেল সেই বাগানে। অপেক্ষা করতে লাগল গাছের ছায়ায় বসে। বাগান থেকে এক এক করে অনেক মালী বাইরে এল। হরি তাদের প্রত্যেককে জল আর মিষ্টি খেতে দিল। বিনি-ময়ে তারাও প্রত্যেকে হরিকে ফুলের তোড়া দিল। সমস্ত ফুলের তোড়া-গুলো বিক্রি করে হরি আরও অনেক মিষ্টি কিনে নিয়ে এসে গাছের তলায়

বসল। এবার সে শুধু মালীদেরই নয়, যারা বাগান দেখতে এল তাদেরও এই মিষ্টি বিক্রি করল। এইভাবে হরি ব্যবসা ফেঁদে বসল। অনেক টাকাও রোজগার করল।

একদিন রাত্রে খুব ঝড়বৃষ্টি সুরু হল। জোরে জোরে বাজ পড়ছিল বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। বড় বড় গাছ হাওয়ায় নুয়ে পড়ে মাটির সঙ্গে ঠেকছিল। মোটামোটা ডাল ভেঙ্গে পড়ছিল। অজস্র ফুল আর পাতা চারিদিকে ঝরে পড়ল।

পর দিন সারা বাগান ভাঙ্গা ডাল, ঝরাপাতা আর ফুলে ভরে গেছল। মালীরা সব চিন্তায় পড়েছে, রাজামশাই বাগান দেখতে আসার আগে কি করে তারা সমস্ত বাগান পরিষ্কার করবে। বাগানের এই অবস্থা দেখলে রাজামশাই কাউকেই আর রক্ষে রাখবেন না, সবায়ের চাকরী যাবে। 'কি করা যায়' এই নিয়ে তারা মুখ চাওয়া-চায়ি করছিল।

তাদের দুশ্চিন্তা দেখে হরি বলল, "আমি সব পরিষ্কার করে ঠিক করে দিতে পারি, যদি ভালো মজুরী পাই।' হরির কথায় মালীরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তারা হরিকে মজুরী দিতে রাজি হলো।

ছেলে পুলেরাও হরিকে খুব ভালবাসত। বেশ কিছু ছেলে মেয়ে জোগাড় করে হরি তাদের বলল, "আধঘণ্টার মধ্যে বাগানটা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে তোমাদের। আজ রাজার বাগান দেখতে আসার দিন।" বলতে না বলতেই ছেলেমেয়ের দল কাজে জুটে গেল। ছুটোছুটি করে ঝরাপাতা ফুল আর পল্লব এক এক জায়গায় জড়ো করে রাখতে লাগল। কি মজাই না লাগছিল তাদের। আধ ঘণ্টার মধ্যে তারা সব পরিষ্কার করে জঞ্জালগুলো বাগানের বাইরে জড়ো করতে লাগল হরি তাদের বাগান থেকে একটু দূরে জঞ্জালগুলোকে জড়ো করতে বললো।

বাগান থেকে একটু দূরেই এক কুমোরের কুঁড়েঘর ছিল। হরি আর

ছেলেমেয়ের দল জঞ্জাল নিয়ে গিয়ে সেইখানে জড়ো করে রাখল। কুমোরকে ডেকে হরি বলল, "তোমার একমাস আগুন জ্বালাবার মাল-মশলা জোগাড় করে দিয়েছি।" কুমোর খুসি হয়ে হরিকে চারটে সোনার মোহর দিল।

এত অল্প সময়ের মধ্যে বাগানটাকে নিখুঁত পরিষ্কার দেখে মালীরাও খুসি হয়ে হরিকে বারোটা সোনার মোহর মজুরী হিসাবে দিল। হরিও খুব খুসি, এক কাজের জন্যে সে দুবার মজুরী পেল। পনরোটা মোহর নিজের কাছে রেখে, সে একটি মোহর দিয়ে মিষ্টি কিনে এনে যে সব ছেলেমেয়েরা তাকে কাজে সাহায্য করেছিলো তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিল। ছেলেমেয়েরা খুসিতে নাচতে নাচতে ফিরে গেল।

হরি বাজার থেকে ছ গণ্ডারও বেশি মাটির কুঁজো কিনে আনল। রাস্তার ধারে একটা আস্তানাও গাড়ল। কুঁজোগুলো ঠাণ্ডা জলে ভর্তি করে 'খাবার জল' এই কথাটা একটা সাইনবোর্ডে লিখে টাঙ্গিয়ে দিল। শ'পাঁচেক লোক মাথায় ঘাসের বোঝা নিয়ে ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তারা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। দর দর করে ঘাম ঝরছিল তাদের কপাল বেয়ে। হরির কাছে থেমে তারা ঠাণ্ডা জল খেল। জলটল খেয়ে তেষ্টা মিটিয়ে তারা বলল, "কি বলে তোমায় ধন্যবাদ দেব! কাছে পয়সা-কড়ি কিছু নেই। ঘাসতো অনেক আছে, কিন্তু বেচব কাকে?"

"টাকা পয়সা আমি চাই না। আমি খুব খুসি হব যদি তোমরা প্রত্যেকে আমাকে একগোছা করে ঘাস দাও।" হরি বলে চলল, "তোমাদের আমি একটা সুখবর দিতে পারি। ঘোড়া বিক্রির জন্যে এক ব্যবসাদার শীগগিরই এখানে আসছেন। তোমাদের সব ঘাস বিক্রি হয়ে যাবে। তোমরা আমাকে কথা দাও যে তোমরা আমার ঘাস বিক্রি না হওয়া পযন্ত তোমাদের ঘাস বিক্রি করবে না তার কাছে।"

যেই ওরা বাজারের দিকে চলে গেল অমনি সেই ব্যবসাদার

পাঁচশো ঘোড়া নিয়ে এসে হাজির হল। যে পথ দিয়ে ঘোড়াগুলোকে নিয়ে এসেছে, সেখানে কোনো ঘাসপাতা কিছুই মেলেনি। হরির কাছে ঘাস দেখতে পেয়ে পাঁচশো রূপোর টাকা দিয়ে সে পাঁচশো গাছা ঘাস কিনে নিল।

হরি তেমনি পথচারীদের জল খাইয়ে তেষ্টা মেটাতে লাগল। জলের বদলে হরি হয় টাকা, না-হয় জিনিসপত্তর নিয়ে নিজের পুঁজি ক্রমশঃ বাড়াতে লাগল।

হরি একদিন খবর পেল, এক সওদাগর সওদা বোঝাই করে অনেক ছোট ছোট জাহাজ নিয়ে আসছেন। নিজের সমস্ত পুঁজি এক করে সে একটা ঘোড়ায় টানা রথ কিনল। ফুল দিয়ে রথটা সাজিয়ে গান গাইতে গাইতে সে জাহাজ ঘাটের দিকে চলল।

প্রথম জাহাজটা ঘাটে লাগতেই হরি জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে দেখা করে তাকে একটা সোনার আংটি উপহার দিয়ে বলল, "এই আংটির দাম তোমার ছয় মাসের মাইনের চেয়েও বেশি। সব কটা জাহাজের মাল আমাকে খরিদ করতে তুমি যদি সাহায্য কর, তাহলে আমি তোমায় আরো টাকা দেব।"

কাপ্তেনও রাজি হয়ে গেলো। সওদাগর জাহাজ থেকে সমস্ত মাল খালাস করে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে হরিকে সমস্ত মাল কিনে নিতে রাজি দেখে খুব খুসি হল। বাজারে গিয়ে দরদস্তুর করতে হবে না ভেবে সওদাগর হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

হরির সঙ্গে কেনা-বেচার কথাবার্তা যখন প্রায় পাকাপাকি হয়ে এসেছে সেই সময় অন্য সব ব্যবসাদারও এসে হাজির হল সেখানে। হরিকে সব কিনে নিতে দেখে তারা রীতিমত ঘাবড়ে গেল। তারা সবাই মিলে নিজেদের সমস্ত টাকা-পয়সা জড়ো করে হরিকে দ্বিগুণ দাম দিয়ে তার কাছ থেকে মালপত্তর কিনে নিল। এদের কাছ থেকে

পেয়ে হরি সওদাগরকে তার প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দিল। কথামতো কাপ্তেনকেও সে পঞ্চাশটা সোনার মোহর দিল। সব দিয়ে-থুয়েও হরি বেশ মোটা লাভ করল।

এবার হরি চৌলক্যের কাছে গেল। তাঁর কাছে হাঁটু গেড়ে বসে হরি তাঁর পায়ের কাছে এক থলে সোনার মোহর রাখল। চৌলক্য জিগ্যেস করলেন, "এটা কি?"

"এটা মাসচারেক আগে দেওয়া আপনার উপদেশের প্রণামী, এই বলে হরি তাঁকে আদ্যপ্রান্ত ঘটনা জানাল।

চৌলক্য পণ্ডিতও শুনে খুব খুসি হলেন। কিন্তু প্রণামী নিতে রাজি হলেন না। বললেন, "রাস্তার সবাই তো আমার কথা শুনেছিল। কিন্তু তাকে এমন করে কাজে লাগাতে তুমিই পেরেছ, আর তো কেউ পারে নি। এই টাকা তুমি বুদ্ধি দিয়ে রোজগার করেছ। এর প্রতিটি পয়সা তোমারই প্রাপ্য।"

বিচারের আসন

উজ্জয়িনী একটি প্রাচীন ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শহর। এই শহরের বাইরে একটা খোলা জায়গায় অনেক ছোট ছোট পাহাড় ছিল। এখানে বালকেরা খেলাধূলো করত। একদিন খেলার সময় একটি বালক মাঠ ছেড়ে এই পাহাড়ের ছোট একটা ঢিপির ওপর উঠে পড়ল। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে সে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল যে একটা চ্যাপ্টা পাথরে হোঁচট খেয়েছে।

বন্ধুদের ডেকে এনে তার আবিষ্কার-করা পাথরের আসনটা সে দেখাল। পাথরের ওপর বসে সে বলল, "আমি হলাম রাজা, আর তোমরা আমার সভাসদ। তোমাদের অভিযোগ আমার কাছে পেশ কর, আমি তার বিচার করব।" সবায়েরই এই খেলা ভালো লাগলো। এক এক করে তারা সবাই মনগড়া অভিযোগ পেশ করতে লাগল। সাক্ষী দেবার জন্যে তাদের মধ্যে থেকেই এক একজনকে ডাকা হল। রাজা সেজে বসেছে যে ছেলেটি সে সমস্ত অভিযোগ শুনে, ঘটনার খুঁটিনাটি বিচার করে রায় দিতে লাগল। সকলেই এই খেলায় বেশ মজা পেত। তাই রোজই তারা এই বিচারের অভিনয় করত। অভিযোগ শুনে, অপরাধীকে সামনে এনে সাক্ষীর সাক্ষ্য ভালো ভাবে বুঝে শুনে পাথরের আসনে-বসা ছেলেটি রায় দিত।

শীগ্‌গিরই বালকটির সূক্ষ্মবিচার-বোধের কথা শহরে ছড়িয়ে পড়ল। লোকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল যে বালকটির নিশ্চয় কোনো ভগবানদত্ত ক্ষমতা আছে। একদিন গ্রামের দুই চাষীর মধ্যে এক টুকরো জমি নিয়ে লড়াই বাধল। রাজার কাছে না গিয়ে তারা সোজা হাজির হল সেই ছোট পাহাড়টির কোলে যেখানে ছেলেরা বিচারের অভিনয় করছিল। পাথরের আসনে-বসা ছেলেটির কাছে তাদের অভিযোগ জানা'ল। ছেলেটি খুব শান্তভাবে তাদের অভিযোগ শুনে রায় দিল। প্রত্যেকেই ছেলেটির নিরপেক্ষ বিচারবোধ ও বুদ্ধিমত্তায় অবাক হয়ে গেল।

সেদিন থেকে শহরের লোকেরা তাদের নালিশ নিয়ে রাজার কাছে না গিয়ে ঐ বালকের কাছে সুবিচারের আশায় আসত তার মতামত নিতে। প্রতিবারেই বালকের রায় পেয়ে তারা খুসি হয়ে ফিরে যেত।

কথাটা শীগ্‌গিরই রাজার কানে গিয়ে পৌছলো। তিনি অবাক হলেন বটে কিন্তু রেগেও গেলেন। "কোথাকার কে এই ফচকে ছেলে যে আমার চেয়েও ভালো বিচার করে," প্রশ্ন করলেন রাজা। "এসব গল্প আমি বিশ্বাস করি না," বলে রাজা নিজেই দেখতে গেলেন।

রাজা সপারিষদ প্রহরীদের নিয়ে সেই ছোট পাহাড়ের দিকে রওনা হলেন। কিছুক্ষণ ধরে বালকদের এই খেলাধূলো দেখতে দেখতে মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন।

নিজের পারিষদদলের কাছে বালকটির জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। "ছোট একটি ছেলের কাছ থেকে আমি এত সূক্ষ্ম বিচারবোধ আশা করিনি। বালকটির এই বিচার বোধের কাছে অনেক জ্ঞানী গুণীকেই মাথা নত করতে হবে।"

"রোজ যে ছেলেটি এই বিচারকের আসনে বসে আজ সে অসুস্থ থাকায় অন্য একটি ছেলে এই আসনে বসেছে।"

রাজা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন; 'এযে এক অদ্ভুত কাণ্ড! পাথরের

আসনটা আমাকে ভালভাবে দেখতে হবে। এটার মধ্যে হয়তো কোনো অলৌকিক শক্তি আছে।"

পাথরের চাঁইটাকে তাই খুঁড়ে বার করা হল। খোদাই করা পাথরের একটি সুন্দর সিংহাসন বেরিয়ে এল। এর চারটি পায়াতে চারটি পরীর মূর্ত্তি খোদাই করা। রাজার পারিষদবর্গের মধ্যে যিনি সবচেয়ে জ্ঞানী ছিলেন তিনি বললেন, "এটা কয়েকশো বছরের পুরনো রাজা বিক্রমাদিত্যের বিখ্যাত সিংহাসন। রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর নিরপেক্ষ ও বিচক্ষণ বিচারের জন্যে বিখ্যাত।"

রাজা এই সিংহাসনটিকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়ে রাজদরবারে রাখবার জন্যে আদেশ জারী করলেন। এও ঠিক করলেন যে তিনি এই সিংহাসনে বসেই বিচারের রায় দেবেন।

পর দিন রাজদরবারে লোকে লোকারণ্য। রাজা এসেই সোজা পাথরের সিংহাসনের দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি যেই বসতে যাবেন অমনি একটি গম্ভীর আওয়াজ শুনলেন, "থামো।"

রাজা থামলেন, চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন। কাউকেই দেখতে পেলেন না। বারবার ভাল করে দেখতে লাগলেন। সিংহাসনের পায়ায় খোদাই করা পরীদের একজনের গলার স্বর শুনতে পেলেন।

পরী রাজাকে প্রশ্ন করছে, "তুমি কি এই সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত? তুমি কি কোনো দিন কিছু চুরি করনি?"

রাজা লজ্জায় মাথা হেঁট করলেন। স্বীকার করলেন যে সম্প্রতি একজন সভাসদের ওপর বিক্ষুব্ধ হয়ে তিনি তার জমির খানিকটা কেড়ে নিয়েছেন। শুনে পরী বলে উঠল, "তাহলে তুমি এই সিংহাসনে বসার অযোগ্য। তিনদিন ধরে এর প্রায়শ্চিত্ত কর". এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পরী তার পাখা মেলে উড়ে গেলো। রাজা তিন দিন উপবাসী থেকে প্রার্থনা করলেন। চার দিনের দিন আবার তিনি সিংহাসনের দিকে এগিয়ে গেলেন। বসতে যাবেন ঠিক সেই সময় দ্বিতীয় পরীটি বলে

উঠল, "থামো। তুমি কি ঠিক বলতে পার যে তুমি কোন দিনও মিথ্যা কথা বলনি?"

রাজা থেমে গেলেন। তাঁর মনে পড়ল ঝঞ্ঝাট এড়ানোর জন্যে তিনি অনেক মিথ্যা বলেছেন। রাজাকে আবার পিছিয়ে আসতে হল। দ্বিতীয় পরীটিও পাখা মেলে উড়ে গেল।

রাজা আবার তিনদিন উপোস করে প্রার্থনা করলেন। এবারে কিন্তু রাজা সিংহাসনের দিকে এগুতে নিজেই ইতঃস্তত করছিলেন। সিংহাসনে যেই তিনি বসতে যাবেন অমনি তৃতীয় পরীটি বলে উঠল, "রাজা, ভেবে দেখ আজ পর্যন্ত তুমি কাউকে অহেতুক দুঃখ বা কষ্ট দিয়েছ কিনা?"

রাজা চুপচাপ পিছিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় পরীটিও উড়ে গেল।

রাজা আরও তিনদিন উপোস ও প্রার্থনা করলেন। পুনরায় রাজ-সভায় গেলেন। সিংহাসনের দিকে এগুতে গিয়ে এবার তাঁর পা কাঁপতে লাগল।

চতুর্থ পরী বলল, "যে সব বালকেরা এই সিংহাসনে বসে খেলাচ্ছলে বিচার করত তারা সবাই নিষ্পাপ আর নির্মল। তোমার যদি মনে হয় যে তুমি এই দেশের সবচেয়ে উপযুক্ত বিচারক তাহলে তুমি এই সিংহাসনে বসতে পার।"

রাজা অনেকক্ষণ ইতঃস্তত করতে লাগলেন। মনে মনে ভাবলেন, একটি বালক যখন এই সিংহাসনে বসতে পারে তখন তিনি কেন পারবেন না। তিনি রাজা, তাঁর মতো ধনী, জ্ঞানী, মানী ও নিরপেক্ষ বিচারক আর কেউই হতে পারে না। তাই এই সিংহাসনে বসবার অধিকার একমাত্র তাঁরই।

এই কথা ভেবেই রাজা সাহস করে এগিয়ে গেলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই চতুর্থ পরীটিও ডানা মেলে সিংহাসনটী সঙ্গে নিয়ে উড়ে গেল।

চতুর স্ত্রী

বহু বছর আগে পুরনো দিল্লী শহরে এক তরুণ ডাক্তার ছোটুলাল আর তার সুন্দরী স্ত্রী নন্দিনী বাস করত। ভুলো মনের জন্যে ছোটুলালকে সবাই চিনত। অনেক চেষ্টা করেও ছোটুলাল এই অভ্যাস ছাড়তে পারে নি। হয় সে ভুল চিকিৎসা করত, নয়তো রুগীদের ওষুধ উল্টো পাল্টা করে ফেলত। আর এই রকম ভুল সে অনেক কাল ধরেই করে আসছিল। সাপে কামড়ানো রুগীকে সর্দি কাশির ওষুধ আর পা মচকানো রুগীকে মাথা ধরার ওষুধ দিয়ে ফেলত।

একদিন এক অল্প বয়সী চাষী সর্দি গর্মীর চিকিৎসা করাতে তার কাছে এল। ঠিক সেই সময়ই একটি বুড়িও গাছ থেকে পড়ে হাত থেঁতলে যাওয়াতে ছোটুলালের কাছে এল। ছোটুলাল তার স্বভাবসিদ্ধ ভুলো-মনে চাষার হাতটা দিল কেটে, আর সর্দি গর্মীর জন্যে বিশেষভাবে তৈরি করা কয়েকটা বড়ি দিলো বুড়িকে।

একথা জানাজানি হলে, লোকেরা ছোটুলালের কাছে চিকিৎসা করাতে আসা ও ওষুধ কেনা বন্ধ করে দিল। ছোটুলালের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হতে লাগল। এখন নন্দিনীকে সে আর সোনার হার বা সুন্দর সুন্দর শাড়ী কিনে দিতে পারে না। এতে নন্দিনীর মনে অশান্তি দেখা দিল। মেজাজও খিটখিটে হয়ে পড়ল। সব সময় ছোটুলালকে সে কথা শোনাতে লাগল।

একদিন সন্ধ্যায় ছোটুলাল বাড়ি ফিরল, এক পয়সাও সেদিন রোজগার হয়নি। খুব সকালেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। সারা দিন ডাক্তারখানাতেই ছিল, কিন্তু একটি রুগীও আসে নি।

নন্দিনী প্রায় পাগলের মতো চেঁচাতে লাগল। "হায়, কি পাপে আমার এই স্বামীভাগ্য। বৌকে খেতে পরতে দেবে এটাই তো স্বামীর কর্তব্য। কাল রাতে তো অন্নের শেষ দানাটুকু পেটে পুরে বসে আছি। আজ ঘরে খাবার জন্যে কুটোটিও নেই। প্রায় তো ভিখিরির হাল হয়েছে, যাও এবার ভিক্ষে করগে।"

এই বলেই সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল এবং ছোটুলালের মুখের উপর দুম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

লজ্জায় ছোটুলালের মাথা হেঁট হয়ে গেল। মুখ নিচু করে মেজের দিকে তাকিয়ে খুব ভয়ে ভয়ে সে নন্দিনীকে বলল, "লক্ষ্মীটি, একটিবার হাসো। যদি তুমি সত্যিই চাও, আমি ভিক্ষেও করব। খালি বলে দাও কোথায় ভিক্ষে করতে যাব।"

নন্দিনী চোখ মুছে একটু হেসে বলল, "রাজার কাছে যাও। যা খুশি তাই চেয়ো। রাজার মেজাজ ভালো থাকলে তুমি সবই পাবে।"

নন্দিনীর কথামতো ছোটুলাল রাজপ্রাসাদের দিকে রওনা হল। রাজপ্রাসাদের তকমাধারী সশস্ত্র প্রহরীদের সামনে দিয়ে সাহস করে সে রাজদরবারের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে রাজা মণি মুক্তার তৈরি সিংহাসনে বসেছিলেন। সঙ্গে তাঁর পারিষদদলও ছিল।

ছোটুলাল রাজার সামনে গিয়ে সসম্ভ্রমে তিনবার প্রণাম করল। সাহসে ভর করে সে বলেই ফেলল, "হে মহারাজ, আমায় কিছু দিন।"

রাজামশাই মুচকি হেসে বললেন, "তুমি কি চাও?" ছোটুলালের মুখে আর কথা জোগায় না। নন্দিনী তো তাকে বলে দেয়নি রাজামশাই-এর কাছ থেকে কি চাইতে হবে। শুধু বলেছিল, 'যা হয় কিছু চেয়ো।'

তাই সে আবার বলল, "যা হয় কিছু দিন।" রাজামশাই তাঁর মন্ত্রীকে বললেন, "যে জমি আর কেউ নিতে চায় না সেটা একে দিয়ে দাও।"

ছোটুলাল মহাখুসি হয়ে গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরলো। ছুটে গিয়ে চীৎকার করে নন্দিনীকে বলে উঠল "দেখ, রাজামশাই কত দয়ালু। আমার প্রার্থনা তিনি মঞ্জুর করেছেন। তিনি আমাকে এমন জমি দিয়েছেন যেটা কেউ নিতে চায় না।"

নন্দিনী ক্ষোভে চুল ছিঁড়তে লাগল। এ ছাড়া নন্দিনীর করারই বা কি আছে। মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হলে ছোটুলালকে সঙ্গে নিয়ে সে জমিটা দেখতে গেল। জমিটা খুবই বড় কিন্তু ঝোপঝাড় আর অগুন্তি বড় বড় পাথরে ভর্তি।

নন্দিনী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। কি করে এই জমি পরিষ্কার করে, লাঙ্গল চষে তাতে বীজ বোনা যাবে, তাই হলো তার চিন্তা। কিন্তু বেশিক্ষণ তাকে ভাবতে হয় না, মাথায় বুদ্ধি খেলে যায়। স্বামীর দিকে ফিরে বলল, "আমি যা করি তুমি তাই বিনা বাক্যব্যয়ে কর।" এই বলে নন্দিনী ঝুঁকে পড়ে জমিটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ছোটুলালও তাই করল। তারা দুজনে ঝুঁকে মাটিতে চোখ গেড়ে আস্তে আস্তে পুরো জমিটায় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

এই সময় একদল ডাকাত ঘোড়া ছুটিয়ে এল। ছোটুলাল ও তার স্ত্রীকে এত মনোযোগ দিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে দেখে ডাকাতদের সর্দার ঘোড়া থেকে নেমে নন্দিনীকে জিগ্যেস করল, "তোমরা কি খুঁজছ? তোমাদের কি কিছু হারিয়েছে?"

নন্দিনী চমকে উঠে তাড়াতাড়ি বলল, "না, না, আমরা কিছু হারাইনি। কিছুইতো হারায়নি আমাদের।" কথায় কথায় সে ডাকাত সর্দারকে সেই জমি থেকে দূরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল।

তার রকম সকম দেখে ডাকাত সর্দারের মনে সন্দেহ হল। মনে

মনে ঠিক করল নন্দিনী যা খুঁজছে তা সে জেনে নেবে। নন্দিনীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল। অনেক পরে নন্দিনী ডাকাত সর্দারের কাছে এসে চুপি চুপি বলল, "আমি তোমাকে একটা গোপন কথা বলব, কিন্তু আগে তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে তুমি কাউকে বলবে না। আমার ঠাকুরদা গতকাল মারা গেছেন। মরবার আগে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে এই মাঠের ভেতর তিনি তিন ঘড়া সোনার মোহর পুঁতে রেখে গেছেন। আমরা সেই ঘড়াগুলোকে খুঁজছি। কিন্তু দোহাই তোমার, আর কাউকে বলো না যেন।"

ডাকাত-সর্দার এই কথা কাউকে বলবে না প্রতিজ্ঞা করে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই নন্দিনী তার স্বামীকে নিয়ে ঘরে ফিরে এল। সারাটা পথ নন্দিনী নাচতে নাচতে, হাসতে হাসতে আর গাইতে গাইতে এল। তার এই হঠাৎ খুসির ভাব দেখে ছোটুলাল অবাক হয়ে গেল।

পর দিন ছোটুলাল আর নন্দিনী আবার মাঠে গেল। জমি দেখে চেনাই দায়। ঝোপঝাড় কেটে ফেলে পাথর সরিয়ে জমিটাকে ভালো করে চষা মনে হচ্ছে। নন্দিনী আনন্দে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, "তিন ঘড়া সোনার মোহরের গল্প শুনিয়ে আমি ডাকাতদের বোকা বানিয়েছি। এই সোনা খুঁজতে তারা এত পরিশ্রম করেছে। আমাদের পরিশ্রম বেঁচেছে। এখন খালি আমাদের গম আর বাজরার বীজ কিনে চাষ করতে হবে।"

নন্দিনী এক বেনের কাছে গিয়ে বীজ কেনার জন্যে কিছু টাকা ধার করল। ছোটুলাল আর নন্দিনী দুজনে মিলে জমিতে সার দিয়ে জল দিল, বীজ পুঁতল। কয়েক মাসের মধ্যেই প্রচুর শস্য ফললো। এখন নন্দিনী বড়লোক। থাকবার বড় বাড়ি আর খাবার প্রচুর জিনিস তাদের। সোনার হার আর সুন্দর সুন্দর শাড়ী পেয়ে নন্দিনী সব সময় হাসি খুসি। ডাকাত সর্দার কিন্তু নন্দিনীর এই মতলব পরে বুঝতে পেরে খুবই চটে গিয়েছিল। প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজছিল।

একদিন রাত্রে নন্দিনী ও ছোটুলালের ঘুমতে যাবার আগে, সেই ডাকাত সর্দার চুপি সাড়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রইল। তার ছায়া দেয়ালের গায়ে পড়ায় নন্দিনীও সঙ্গে সঙ্গে ডাকাত-সর্দারকে চিনতে পারল। ভাঙ্গা কাঁচ আর মরচেধরা পেরেক দিয়ে নন্দিনী একটা ঘড়া ভরতি করল। ঘড়ার মুখটা বরফি দিয়ে ঢেকে দিলো। ছোটুলালকে কানে কানে বলল যে পাঁচ মিনিট পরে যেন সে তাকে ডেকে খুব চেঁচিয়ে জিগ্যেস করে যে তাদের ধনসম্পত্তি কোথায় আছে।

কথামতো কয়েক মিনিট পরে ছোটুলাল শোবার ঘরে এসে নন্দিনীকে জিগ্যেস করল, "হ্যাঁ গা, আমাদের টাকা পয়সা সব কোথায় রেখেছ? আশা করি নিরাপদ জায়গাতেই রাখা আছে।"

"এ নিয়ে আর তোমাকে চিন্তা করতে হবে না", নন্দিনী জবাব দিল। "তুমি তো জানই আমি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী। আমাদের টাকা পয়সা সব নিরাপদ জায়গাতেই আছে। সেগুলো একটা ঘড়ায় ভর্তি করে মুখের ওপর বরফি দিয়ে ঢেকে রেখেছি। কেউই জানতে পারবে না", এই বলে নন্দিনী আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল।

ডাকাত-সর্দার পর্দার আড়াল থেকে সব কথা শুনে মনে মনে হাসল। এইবার সে নন্দিনীর ওপর তার শোধ তুলবে। ছোটুলাল আর নন্দিনীর নাক ডাকিয়ে না ঘুমনো পর্যন্ত সর্দার অপেক্ষা করতে লাগল। যখন তারা ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ল, সর্দার আস্তে আস্তে খাবার ঘরে ঢুকে বরফির কলসীটা দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি সেটা তুলে নিয়ে চুপিসাড়ে পালাল।

সর্দার চটপট দলের লোকের কাছে গিয়ে হাজির হল। বরফির ঘড়াটা দেখিয়ে সবাইকে বলল যে এই বরফির তলায় ছোটুলাল ও নন্দিনীর যাবতীয় পুঁজি আছে। সবাই কলসীটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি বরফিগুলো মাটিতে ফেলে দিয়ে তারা টাকা ও গয়নাগাঁটি

খুঁজতে লাগল। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে মুঠো করে বার করল ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো আর মরচে পড়া পেরেক। তাদের হাত কেটে রক্ত পড়তে লাগল। বরফিগুলো তারা আগেই মাটিতে ধূলোয় ফেলে দিয়েছিল। তাই সেগুলোও খাবার মতো ছিল না। তারা আবার শোধ নেবার প্রতিজ্ঞা করল।

এক হপ্তা পরে, সন্ধ্যা যখন হয় হয়, নন্দিনী বাড়ির বাইরে একটা গোলমাল শুনতে পেল। ডাকাত-সর্দারের গলার স্বর চিনতে পেরে শব্দটা যেদিক থেকে আস্‌ছিল পা টিপেটিপে সেদিকে এগিয়ে গেল নন্দিনী। খুব মন দিয়ে তাদের কথা শোনবার চেষ্টা করতে লাগল। ডাকাতরা ঠিক করল রাত হলে তারা এক এক করে ঢুকে ছোটুলাল ও নন্দিনীর হাত, পা, মুখ বেঁধে ফেলে তাদের সমস্ত গয়না গাঁটি নিয়ে পালাবে।

সর্দার নন্দিনীকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যে ঠিক করল যে নন্দিনীকে একটা বেশ শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা হবে যাতে সে কোনো দিন একথা ভুলতে না পারে।

নন্দিনী তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে একটা ধারালো ছুরি নিয়ে এল। তারপর জানালার ধারে গিয়ে আড়ালে দাঁড়াল। বাড়ির গায়ে লতানো গাছের খসখস শব্দ শুনে সে বুঝল যে এবার ডাকাতেরা আসার তোড়-জোড় করছে। সঙ্গে সঙ্গে জানালার ভেতর দিয়ে একজনের মুখ দেখা দিল। নন্দিনী অমনি ছুরি দিয়ে তার নাকটা ঘ্যাঁচ্‌ করে কেটে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মাথা সরিয়ে নিয়ে ডাকাতটা নিচে লাফিয়ে পড়ল। সর্দার তার নাক থেকে রক্ত পড়ছে দেখে ভাবল নিশ্চয়ই অন্ধকারে কোনও ধারালো পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে নাক ফাটিয়েছে। ঠিক কি জিনিসটা দেখবার জন্যে সর্দার এবার নিজেই জানালা বেয়ে উঠল।

জানালার ভেতর মুখ ঢোকাতেই নন্দিনী তারও নাক কেটে দিল। দুহাতে নাক চেপে ধরে সর্দার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। এবার

প্রতিজ্ঞা করল যে যতক্ষণ না সে এর প্রতিশোধ নিতে পারছে ততক্ষণ সে অন্নগ্রহণ করবে না।

বসন্ত পেরিয়ে গ্রীষ্ম এল। দিনের বেলায় প্রচণ্ড গরম, সন্ধ্যা বেলায় ফুরফুরে হাওয়া বয়। ছোটুলাল ও নন্দিনী চাঁদের আলোয় আর তারা ভরা আকাশের নিচে বাগানে ঘুমত।

রাতে নন্দিনী স্বপ্ন দেখল যে সে উটের পিঠে চেপে যাচ্ছে। ছোটুলাল তার আগে আগে আর একটা উটের পিঠে চেপে চলেছে। দূরে সুন্দর সুন্দর বাগান আর পামগাছ দেখা যাচ্ছে। সুন্দর এক রাজকুমার একটা সাদা ঘোড়া ছুটিয়ে নন্দিনীর দিকে এগিয়ে এল। রাজকুমার তার দিকে একটি সুন্দর সোনালী শাড়ী আর চূণী বসানো মুকুট এগিয়ে ধরল। নন্দিনী হাত বাড়িয়ে যেই এই উপহার নিতে যাবে অমনি আচম্‌কা ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভেঙ্গে যখন সে দেখলে যে সে উটের পিঠে নেই তখন সে আশ্চর্য হয়ে গেল। আসলে তার খাটখানা চারজন ডাকাতে মিলে কাঁধে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। আর বাকি ডাকাতরা সুমুখে হেঁটে হেঁটে চলেছে। "হায় ভগবান, এবার সত্যিই ধরা পড়েছি", নন্দিনী ভাবল। "কে জানে, এরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে আর কিই বা করবে। এরা আমাকে দয়া করে মোটেই ছেড়ে দেবে না।"

ঠিক সেই সময় ডাকাতদের মধ্যে একজন বলে উঠল, "বাবা, কি ভারী রে, কাঁধ তো ভেঙ্গে গেল। আয়, খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেওয়া যাক।" সবাই তাইতে রাজি হয়ে একটা বটগাছের তলায় এসে খাটখানা নামিয়ে রাখল। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে তারা সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। নন্দিনী আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে তার জায়গায় চাদরটাকে পুঁটলি পাকিয়ে শুইয়ে রেখে তাড়াতাড়ি বটগাছের ওপর চড়ে বসল।

বটগাছের বড় বড় পাতা আর নিচু নিচু ডালের আড়ালে নন্দিনী নিজেকে লুকিয়ে রাখল। একটা ডালের ওপর আরাম করে বসে

সে ডাকাতদের দেখতে লাগল। তার মাথায় হঠাৎ পালাবার বুদ্ধি খেলে গেলো। কালো শাল দিয়ে নিজেকে সে পুরো মুড়ে নিল। তারপর নানারকম অদ্ভুত সুর করে চেঁচিয়ে হাত পা ছুঁড়তে লাগলো।

ডাকাতরা ঘুম ভেঙ্গে ভয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগল। তার ভুতুড়ে চীৎকারে সবাই ভয় পেয়ে গেল।

ওপরে গাছের দিকে চেয়ে ডাকাতরা দেখল, একটা কালো রাক্ষস তাদের দিকে হাত নাড়ছে। "এটা নিশ্চয় গেছো ভুত। আমরা এখানে বসে ওকে বিরক্ত করেছি বলে চটে গেছে মনে হচ্ছে", ডাকাতরা এই এই কথা বলাবলি করতে করতে উঠে পড়ে পেছনে না তাকিয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে দৌড় দিল।

নন্দিনী কিছুতেই হাসি সামলাতে পারল না। গাছ থেকে নেমে এসে, নিজের জিনিস-পত্তর তুলে নিয়ে, মহা খুসি হয়ে বাড়ির দিকে চলল। মনে মনে ভাবল ডাকাতরা আর কোনোদিনও তার বাড়িমুখো হবে না।

এই পর্যায়ে প্রকাশিত বই :

বাপু (মহাত্মা গান্ধীর সচিত্র জীবনী—দুই খণ্ডে)	লেখা ও চিত্র : এফ. সি. ফ্রীট চিত্রশিল্পী : প্রেমানন্দ শর্মা
কাশ্মীর	লেখিকা : মালা সিং
পক্ষী জগৎ	জমাল আরা
নদী কথা	লীলা মজুমদার
শিখর থেকে শিখরে	ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং
স্বর্গ ভ্রমণ ও অন্যান্য গল্প	লীলাবতী ভাগত
সরস গল্প	মনোজ দাস
স্বরাজ্যের কথা (১ম খণ্ড)	বিষ্ণু প্রভাকর
আমাদের রেলের কথা	জগজিৎ সিং
ভারতে বিদেশী যাত্রী	কে. সি. খান্না
এস আমরা নাটক করি	উমা আনন্দ
বাঘের মাসী বেড়াল	এম. ডি. চতুর্বেদী
সে অনেক কালের কথা	এম. চোকসী ও পি. এম. যোশী
রোহান্তা ও নান্দ্রিয়া	কৃষ্ণ চৈতন্য
যুগ যুগের কাহিনী	শান্তা রঙ্গচারী
বড় পানি	লীলা মজুমদার
বীরের কাহিনী	রাজেন্দ্র আয়ন্তী
যে সব আবিষ্কারে দুনিয়া পাল্টে গেছে (দুই খণ্ডে)	মীর নীজাবত আলী
স্বরাজ্যের কথা (২য় খণ্ড)	সুমঙ্গল প্রকাশ
ভারতের হকি খেলা	শরদিন্দু সান্যাল
মোরা	মুলক্ রাজ আনন্দ
ডাকটিকিটের মজার কাহিনী	সত্যপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
অলিম্পিক ও তার নায়কেরা	মেলভিল ডিমেলো
অযোধ্যার রাজকুমার	হংস মেহতা
গাছের কথা	রাস্কিন বণ্ড

এইসব বই সমস্ত ভারতীয় ভাষায় পাওয়া যায়